দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ১২ ডিসেম্বর, ২০২২।। ২৫ অগ্রহায়ণ - ১৪২৯।।
যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

ডিএ : পশ্চিমবঙ্গে কত

কেরল	৩৬ %
তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ	৩৪ %
উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র	৩১ %
ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ড	২৮ %
কর্ণাটক	২৭ %
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৮ %
হরিয়ানা ও পঞ্জাব	২৮ %
অসম	৩১ %
ওড়িশা	৩৪ %
হিমাচল প্রদেশ	৩১ %
গোয়া ও উত্তরাখণ্ড	৩৪ %
রাজস্থান	৩৪ %
গুজরাট ও বিহার	২৮ %
পশ্চিমবঙ্গ	৩ %

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৩৪ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীরা এতো বঞ্চিত কেন? আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তারা পাচ্ছেন না বকেয়া ডিএ। আদালতের রায় অমান্য করে সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে রাজ্য, যাতে বকেয়া ডিএ দিতে না হয়।

ডিএ নিয়ে গড়িমসি

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১২ ডিসেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

মমতা জানেন পরিবারের বিনাশ আসন্ন তাই বধির সেজে গিয়েছেন

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

নাম বদলায়, কপাল নয় ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে মানুষকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের পথে ☐ নরেন্দ্র মোদী ☐ ৮

জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতি বিদ্বেষের পোস্টার ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

আন্দোলন আর দাবিতে অধিকারের যে ভাতা সত্যিই মহার্ঘ্য ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১১

পশ্চিমবঙ্গ আজ মাদক কারবারিদের মুক্তাঞ্চল ☐ সঞ্জীব দে ☐ ১৩

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন কেন দরকার ☐ তাপস দে ☐ ১৫

দেশ ও জাতির বিকাশে অস্ত্র ও যুদ্ধনৈপুণ্য অনিবার্য শর্ত ☐ মলয় দাস ☐ ১৭

রাজ্যের ভাঁড়ে মা ভবানী ☐ দীপ্তাস্য যশ ☐ ২৩

সরকারি কর্মচারীরা চাইলে প্রশাসনের চাকা আটকে দিতে পারেন ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ২৬

লাচিত বরফুকনের তলোয়ারের সামনে নতজানু হয়েছিল মুঘল শাসক ☐ রণিতা চন্দ ☐ ৩১

ভারতের যে ইতিহাসের নায়ক এক অহোম সেনাধ্যক্ষ ☐ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ☐ ৩৪

সাক্ষাৎকার : 'ভারতেই গড়ে উঠেছিল বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা' ☐ ৩৬

বাঙ্গালি জাতির সচেতন হবার সময় এসেছে ☐ চন্দন রায় ☐ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ অন্যরকম : ৩৫ ☐ খেলা : ৩৮-৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ১৯ ডিসেম্বর ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৯ ডিসেম্বর ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আলোকবর্তিনী

রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর নির্বাচন শুধু যে ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত তাই নয়, এই ঘটনা জাতীয় প্রেক্ষাপটে জনজাতি সমাজের উত্থানের কথাও বলে। একটা সময় ছিল, যখন ভারতের রাজনীতি বিলেত ফেরত বা বিলেতে শিক্ষিত নেতাদের ঘিরেই আবর্তিত হতো। দ্রৌপদী মুর্মু সেই 'লুটিয়েন অ্যারিসট্রোক্র্যাসি'-এর মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়--- শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর জীবন ও তাঁর ভুবন--- দুই-ই উঠে আসবে স্বস্তিকার পাতায়। সেই সঙ্গে থাকবে ভারতের জনজাতি সমাজ নিয়ে কয়েকটি রচনা। লিখবেন তথাগত রায়, ড. জিষ্ণু বসু, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, হীরক কর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড নম্বর-সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রাপ্য লইয়া বঞ্চনা

এঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হইলে গাড়ি অচল হইয়া পড়ে। অতঃপর চালক যতই সুপ্রশিক্ষিত হউন, অচল গাড়িকে টানিয়া লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রশ্ন উঠিবে, অচল গাড়ির উপমা কেন দেওয়া হইতেছে? কারণ সরকারি কর্মচারীরা সরকারি প্রশাসনের এঞ্জিনবিশেষ। সেই এঞ্জিন কোনো কারণবশত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সরকারি প্রশাসন অচল হইয়া পড়িবে।

সম্প্রতি সেই সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে। সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘ্যভাতা প্রদান করা লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেকদিন ধরিয়াই টালবাহানা করিতেছে। এই ব্যাপারে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকিলেও রাজ্য সরকার উচ্চবাচ্য করে নাই। বরং রাজ্য সরকার আদালতকে হলফনামা দিয়া জানাইয়াছে এক্সগ্রেসিয়া-সহ মহার্ঘ্যভাতা প্রদান করিলে রাজ্য দেউলিয়া হইয়া যাইবে। এমনকী রাজ্যের এক মন্ত্রী মহার্ঘ্যভাতা সরকারি কর্মীদের হকের পাওনা নহে বলিয়া তোপ দাগিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি হইল, মুদ্রাস্ফীতির সহিত আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিবার নিমিত্ত সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ্যভাতা প্রদান করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় একটি কথা বিস্মৃত হইয়াছেন যে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে সরকারি কর্মীদের সময়মতো মহার্ঘভাতা প্রদান করা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারও কর্মীদের মহার্ঘ্যভাতা লইয়া অদ্যাবধি কোনো ওজরআপত্তি তোলে নাই। সুতরাং মহার্ঘ্যভাতা যে সরকারি কর্মীদের ন্যায্য পাওনা তাহাতে সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও মহার্ঘ্যভাতা প্রদান করিতে হইবে। এবং তাহা এক্সগ্রেসিয়া সহ।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের কোষাগারের হাল এমন করুণ হইল কেন? এতাদৃশ করুণ যে যাহারা সরকারি প্রশাসনের এঞ্জিনস্বরূপ তাহাদের প্রয়োজনীয় তেল-মোবিল জোগাইতে অপারগ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ, সত্তরের দশকের শেষের দিকেও ভারতের জিডিপিতে পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিত। তাহার পর দীর্ঘ বাম শাসন ও তৃণমূল শাসনে পশ্চিমবঙ্গের অবদান প্রায় তলানিতে পৌঁছিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের সর্বাধিক মুদ্রাস্ফীতির রাজ্য। দেশের সর্বাধিক ভিখারি পশ্চিমবঙ্গে থাকেন। সিঙ্গুর হইতে টাটারা চলিয়া যাইবার পর পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের চিরস্থায়ী মন্বন্তর শুরু হইয়াছে। তাহার উপর, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার খেলা-মেলায় অনাবশ্যক অর্থের জোগান দিয়া রাজ্যকে দিন দিন দেউলিয়া হইবার পথে আগাইয়া দিতেছেন। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়, যেইক্ষণে সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য মিটাইতে পারিতেছে না, সেইক্ষণে কয়েক সহস্র ক্লাবকে দুর্গাপূজা করিবার অর্থ জোগাইতে তাহাদের হস্ত কম্পিত হইয়া উঠে নাই। এই খাতে খরচ হইয়াছে আড়াইশত কোটি টাকা। খাদ্যের জন্য ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলাইবার জন্য দরিদ্র মা যেমন তাহাকে চুষিকাঠি ধরাইয়া দেন, ঠিক তাহারই অনুরূপ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো তৃতীয় শ্রেণীর প্রকল্প চলিতেছে সাড়ম্বরে। সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে কিন্তু শিশু খাদ্য পাইতেছে না। সে দিন দিন আরও অপুষ্ট হইতেছে এবং অন্ধের মতো আগাইয়া যাইতেছে অনিবার্য পতনের দিকে।

রাজ্য সরকারকে এইসব কথা ভাবিতে হইবে। জনগণের করের টাকা নয়ছয় না করিয়া সরকারকে ভাবিতে হইবে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে একটি সদর্থক পরিমণ্ডল গড়িয়া তোলা যায়। সরকারি কর্মীদের বাদ দিয়া প্রশাসন চলিতে পারে না। সুতরাং সরকারি কর্মীদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লওয়াই আশু কর্তব্য। তাহার জন্য খেলা-মেলা কয়েক বৎসর বন্ধ থাকে তো থাকুক। সরকার খরচ না জোগাইলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্লাবগুলি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিব্য পূজা করিবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলিকে বাছিয়া লওয়া হউক। অধ্যাপকের গৃহিণী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লাইনে দাঁড়াইয়া পাঁচশতটাকা লইতেছেন—এই দৃশ্য অতীব মর্মান্তিক! সরকারকে মনে রাখিতে হইবে, কর্মচারীদিগের সহযোগিতা না পাইলে প্রশাসন অচলায়তনে পরিণত হইবে। সরকারও বাঁচিবে না।

সুভাষিতম্

অসদ্ভিঃ শপথেনোক্তং জলে লিখিতমক্ষরম্।
সদ্ভিস্তু লীলয়া প্রোক্তং শিলালিখিতমক্ষরম্।।

কোনো কাজের জন্য দুষ্টপ্রকৃতির লোকের শপথ গ্রহণ জলে লিখিত অক্ষরের সমান। কিন্তু সৎ ব্যক্তির হাসি মজার ছলেও শপথ গ্রহণ শিলালিপির মতো হয়ে থাকে।

মমতা জানেন পরিবারে বিনাশ আসন্ন তাই বধির সেজে গিয়েছেন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। অথবা বিনাশ যার হতে চলেছে কোনো কথা তার কানে ঢোকে না যদি সে কালা হয় বা কালা সেজে থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকর্ম আর হাবভাব দেখলে বোঝা দায় যে তৃণমূল দল আর রাজ্য সরকার নিয়ে তিনি ভাবিত বা অশান্তিতে রয়েছেন। সারা দেশে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনো চেন্নাই, কখনো আবার আজমের শরিফ। অথবা পুষ্কর। মাথার উপর নাগরিক আইনের খাঁড়া। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। তার থেকেও বড়ো বিপদ নিজের ঘর আর পরিবার নিয়ে। মাঝে মাঝে বিজেপির বিরুদ্ধে হুংকার দিলেও ওই দলের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার যে ব্যর্থ রাজনৈতিক চেষ্টা মমতা চালাচ্ছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনি চিন্তিত কি না। মমতা জানেন ক্ষমতার চূড়ায় বিজেপি। মানতে বাধ্য হয়েছেন তারা দেশের সব চাইতে শক্তিশালী দল। তবে হাস্যকরভাবে তাদের সরকারের প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিভেদ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন মমতা। আমার মতে মমতা এই মুহূর্তে অনেকটাই দিশাহারা। সবই তাঁর হতাশার প্রকাশ। জাতীয় কংগ্রেসের ঘরানায় তৈরি মমতা তৃণমূল দলকে পরিবারের মতো চালান। জাতীয় কংগ্রেসের মতো তৃণমূলও এখন ফ্যামিলি পার্টি।

অনেকদিন থেকেই তৃণমূলের অন্দরে কানাঘুষো চলছে ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছে ইডি আর সিবিআই। অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। কেবল সাক্ষী হিসেবে তাঁকে ১৭ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে। তিনি ১১৫২ পাতার উত্তরে আনুমানিক ২০০ পাতার বক্তব্য আর ৯০০ পাতার অনুচ্ছেদ আর সংযোজন দিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূল বলছে এ সব সাজানো। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাক্ষী ছিলেন। পরে জেল খাটানো হয়। নাম না করে রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন বড়ো চোর ধরা পড়বে।

শুভেন্দুবাবুর মতে ডিসেম্বরের পর মমতা সরকার আর চলবে না। পঙ্গু হয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আগেই বলেছি রাজনৈতিকভাবে মমতা জাতীয় কংগ্রেসের ঘরানায় তৈরি। পুত্র সঞ্জয় গান্ধীকে ছোটো গাড়ির কারখানার একমাত্র লাইসেন্স পাওয়াতে গিয়ে সংসদে বোবা-কালা সেজেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল সঞ্জয়কে ৩০০ একর জমি দেন। সেই কংগ্রেস ঘরানায় তৈরি মমতা যে অভিষেকের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবেন না সেটাই তো স্বাভাবিক। অভিষেকের সহধর্মিণী রিজুরা নারুলা আর শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের বিরুদ্ধেও তদন্ত চলছে। মমতা সেখানেও নাক গলিয়ে রেখেছেন। শুভেন্দুবাবুর কথা মান্যতা দিতেই হবে, কারণ তিনি বিরোধী নেতা। না জেনে বা বুঝে কথা বলার মানুষ নন। যদি ভুল হয় তিনি নিজেকে দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রমাণ করবেন। সে দায় যেমন তাঁর তেমনই আবার কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাদেরও যাঁরা তাঁকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। নজর করার বিষয় ডিসেম্বরে মমতা সরকারের বিপর্যয় নিয়ে রাজ্যের নেতারা যতটা ভাবিত বা ফোঁসফোঁস করছেন, এক দিলীপ ঘোষ বাদে সব কেন্দ্রীয় নেতাই চুপচাপ। আমার ধারণা ডিসেম্বরের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। মনে রাখা দরকার, মমতা সরকারের দুর্দিন যদি ডিসেম্বরেই এসে পড়ে তা কিন্তু হবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই। সাধারণভাবে এই নজির বড়ো একটা নেই। প্রধানভাবে যখন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার রয়েছে। কারণ সেটা সহযোগিতামূলক গণতন্ত্রের পরিপন্থী। সমবেদনার ঝড়ে মমতা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন। কেন্দ্রে থাকা বিজেপির মতো শক্তিশালী রাজনৈতিক দল সে কাজে সহজে ফাঁসবে বলে মনে হয় না যদি না খুব বড়ো কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। তৃণমূলের উঁচুতলার নেতারা অবশ্য দাবি করেছেন সব কেন্দ্রীয় অর্থের মতো গ্রামোন্নয়নে ১০০ দিনের কাজের টাকাও পেয়ে যাবে রাজ্য। অর্থনৈতিকভাবে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে ইডি সিবিআইয়ের ব্যাপারে তারা জানেন না কারণ ওই বিষয় কেবল মমতা জানেন।

যদি ধরে নিই যে মমতা সব জানেন। এটা সহজেই অনুমেয় তিনি কী জানেন? আর তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিতে পারেন। মমতা ও অভিষেক দুজনেই দাবি করছেন দোষীদের শাস্তি হোক। প্রশ্ন উঠছে, আসল বা মূল দোষী কে? আন্দাজ করা যাচ্ছে। তবে প্রমাণাভাবে সরাসরি তার নাম বলা যাচ্ছে না। যদিও জনমানসে সেই দুর্নীতিবাজের নাম লেখা হয়ে গিয়েছে।

মমতা ও অভিষেক দুজনেই দাবি করছেন দোষীদের শাস্তি হোক। প্রশ্ন উঠছে, আসল বা মূল দোষী কে? আন্দাজ করা যাচ্ছে। তবে প্রমাণাভাবে সরাসরি তার নাম বলা যাচ্ছে না।

নাম বদলায়, কপাল নয়

নামদাত্রীষু দিদি,

কেউ কেউ আপনাকে 'স্টিকার দিদি' বলেন। আমি তাঁদের পছন্দ করি না। আমি মনে করি আপনি নাম দিতে ভালোবাসেন বলেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গে অন্যভাবে সাজান। অনেকেই কন্যা সন্তানদের শিক্ষার জন্য অনেক প্রকল্প করেছেন কিন্তু আপনার মতো 'কন্যাশ্রী' নাম দিতে পেরেছেন ক'জন? আসলে দিদি যাঁরা আপনার সমালোচনা করেন তাঁরা আপনার বইটই পড়েই না। আপনার যে 'নামাঞ্জলি' নামে একটা গোটা বই আছে তার খবরই-বা কে রাখে?

তবে দিদি নাম রাখলেই কি সব হয়? আমি আজ একটা অবান্তর কারণে চিঠি লিখছি। মানে আপনার কাছে বিষয়টা অবান্তর মনে হতে পারে। রাজ্যে মহার্ঘ্য ভাতা মেলে না, চাকরি বিক্রি হয়, মন্ত্রীরা জেলে থাকেন, এই সব বড়ো বড়ো কারণের মাঝখানে মেয়েদের জন্য শৌচাগারের কথা অবান্তর মনে হতেই পারে। তাতে অন্যায় কিছু নেই।

ভারতে প্রতি বাড়িতে শৌচালয় তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। অনেক আগেই করা দরকার হলেও নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সেটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নারীর সুরক্ষার জন্যও বাড়িতে শৌচাগার অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক নির্যাতন তাতে কমে। উন্মুক্ত জায়গায় যাওয়ার ঝুঁকি কমে। আবার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্যও এটা দরকার।

উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসও দেশজুড়ে চলছে। কাজও হচ্ছে। কিন্তু এই রাজ্যে মেয়েরা যখন পথে বেরোন, তাঁরা পরিচ্ছন্ন শৌচালয়ের সুবিধা পান কি? শৌচালয় নিয়ে প্রচারসর্বস্বতার আড়ালের চিত্রটি কী, তা সম্প্রতি ধরা পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মহিলা পুলিশকর্মীদের অবস্থার খবর জেনে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক থানায় রাত আটটার পর মহিলা কর্মীদের ছুটি নিতে হয়। কারণ, তাঁদের জন্য শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত নেই। অনেক এলাকার থানায় শৌচালয় ব্যবহারের প্রয়োজন পড়লে অনেক দূরে যেতে হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে অন্যত্র যেতে হলে সঙ্গে বায়ো-টয়লেটের গাড়ি থাকে না। অর্থাৎ, মহিলা কর্মী থাকলে শৌচালয়ের মতো ন্যূনতম সুবিধাটুকু থাকা যে প্রয়োজন, সেই বোধই নেই রাজ্যের। আপনি মহিলা বলে দাবিটা আরও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি কতই-বা করবেন। মাসে মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকা দিচ্ছেন। আবার শৌচালয়ও দিতে হবে নাকি?

মেয়েদের শৌচালয় নিয়ে অব্যবস্থার চিহ্ন স্কুলেও। কিছু দিন আগে একটা খবরের কাগজে দেখলাম, উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে তিন শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের জন্য কোনও শৌচালয় না থাকায়, তাঁদের প্রতিবেশীদের বাড়ি কিংবা খোলা মাঠ ব্যবহার করতে হয়। বহু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উপযুক্ত শৌচাগার না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় শিশু থেকে কর্মী, সকলকেই। ২০১২ সালে 'দিশা' প্রকল্পে (আপনার দেওয়া নাম) হাসপাতাল চত্বরে আশাকর্মীদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগারের সঙ্গে শৌচাগার তৈরির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রকল্প আদৌ সর্বত্র গড়ে উঠেছে কি? খাস কলকাতায় কিছু দূর অন্তর সুলভ শৌচালয় গড়ে উঠলেও তার ক'টি মেয়েদের ব্যবহারের মতো উপযুক্ত? মনে রাখা প্রয়োজন, মেয়েদের শৌচালয় বলতে শুধুমাত্র একটি কাঠামো বোঝায় নয়, তাতে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা থাকা দরকার। মনে রাখতে হয়, একজন সুস্থ মা না থাকলে সুস্থ শিশু পাওয়া যায় না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মক্ষেত্রের শৌচালয়ে সুলভে স্যানিটারি ন্যাপকিন পাওয়ার দাবি উঠলেও হাতেগোনা ক্ষেত্র ছাড়া সেই সুবিধার দেখা মেলে না। অথচ এর জন্যও কেন্দ্রের উদ্যোগ রয়েছে। আমলাদের জিজ্ঞাসা করুন জানতে পারবেন। কেন্দ্র আলাদা টাকাও বরাদ্দ করে। কিন্তু এ রাজ্যে শুনেছি সামান্য জলও পর্যাপ্ত থাকে না। ফলে শৌচাগারগুলি সংক্রমণের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে।

সুতরাং, অনেক মেয়েকেই দিনে দশ ঘণ্টা শৌচাগারে না যাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করতে হয়। শারীরিক সমস্যা তো বটেই, পরিসংখ্যান বলছে, গণশৌচাগারের অভাবে ৫০ শতাংশ মেয়ে মানসিক চাপে ভোগেন। নিরাপত্তার প্রশ্নটিও অগ্রাহ্য করার নয়। গণশৌচাগার ব্যবহার করতে গিয়ে পুরুষদের হাতে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে, এমন উদাহরণ কম নেই। এই রাজ্যে এখনও লিঙ্গবৈষম্যের শিকড় যে কত গভীরে, মেয়েদের উপযুক্ত শৌচালয়ের অভাব তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সরকার করে না বলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও তথৈবচ। রাস্তা দেখান দিদি। মোদীজী অনেক আধুনিক হয়ে লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেও এই বিষয়টায় জোর দিতে বলেছিলেন। কিন্তু শোনা হয়নি। আসলে লোকটাই তো খারাপ। তাই তিনি বললে ভালো কথাও খারাপ।

বাড়ির বাইরে পা রাখলেই স্বাস্থ্য, সুরক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ বাধা সৃষ্টি হলে তাঁরা যথেষ্ট সংখ্যার কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবেন কীভাবে? বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে মহিলাদের সম্মানরক্ষার প্রসঙ্গটি উঠে আসে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্মক্ষেত্রে আরও বেশি সংখ্যায় মেয়েদের যোগদানের উপর জোর দেন, অথচ সেই দেশেরই এক রাজ্যে মেয়েদের বড়ো অংশের জন্য সামান্য পরিচ্ছন্ন শৌচালয়ও নেই। ঋতুকালীন সময়ে স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্রে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হন অনেকে।

'স্বচ্ছ ভারত' তৈরির অভিযান চলছে। কিন্তু 'নির্মল বাংলা' (আপনার বদলানো নাম) হবে কি? □

অতিথি কলম

নরেন্দ্র মোদী

বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে মানুষকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের দিকে

ভারত আজ জি-২০ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার সম্মান লাভ করেছে। আগে জি-২০ দেশগুলির পূর্ববর্তী ১৭ জন প্রধানের সময়কালে তাঁরা সমগ্র বিশ্বের বৃহৎ অর্থনৈতিক স্থিরতা, আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থা, বিভিন্ন ঋণগ্রস্ত দেশের ঋণের বোঝা হালকা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আমরা এই বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে এর সুফল পাচ্ছি। তাই আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। এই মূল্যবোধগুলিকে প্রসারিত করতে হবে।

আজ যখন ভারতের হয়ে এই সংগঠনকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভার আমার ওপর পড়েছে তখনই মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, জি-২০-কে কি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে? আমরা সদস্য দেশগুলির মানসিকতার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারবো যাতে সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধিত হয়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা তা পারব।

এক্ষেত্রে আমরা জানি মনের অবস্থা নির্ধারণে বাস্তব পরিস্থিতিই বড়ো ভূমিকা নেয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে মানবজাতিকে বরাবরই অভাবের মধ্যে বাঁচতে হয়েছে। সীমিত সম্পদের অধিকার নিয়ে আমাদের মধ্যে লড়াই চলেছে।

এর কারণ আমাদের নিজেদের টিকে থাকাটাই নির্ভরশীল ছিল অন্যকে বঞ্চিত করার ওপর। নির্দিষ্ট ধারণা, মতবাদ বা পরিচয়ের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক তুমুল প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বই যে কারণে প্রধান নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আজও সেই জালে অবরুদ্ধ হয়ে আছি। এর প্রমাণস্বরূপ আজও বিভিন্ন দেশের জমিগত অধিকার বা অন্য সম্পদ আরও বৃদ্ধি করার জন্য প্রায়শই যুদ্ধ বেঁধে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জিনিসপত্রের সরবরাহের ক্ষেত্রেও অস্ত্রের ব্যবহার সামনে এসে দাঁড়ায়।

হায়! সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেখতে হয়েছে যখন মানবজাতি বাঁচার আতঙ্কে ভুগছে তখনও রোগের টিকা কোনো কোনো দেশ গুজামজাত করে রেখেছে। বিতরণ করার মানসিকতা আয়ত্ত করতে পারেনি। অবশ্যই কেউ কেউ যুক্তি দিতেই পারেন যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা ও লোভ অন্যতম মনুষ্য প্রবৃত্তি। আমি এর সঙ্গে সহমত পোষণ করি না। কেননা যদি মানুষের প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত ভাবেই স্বার্থান্ধ হতো তাহলে বিশ্বের নানান অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতির আবেদন যেগুলি চিরকাল আমাদের মানবজাতির মূলগতভাবে এক ও অখণ্ডতার কথা বলেছে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাদৃত হতো না। বিনষ্ট হয়ে যেত। এমনই একটি চিরকালীন পরম্পরা আমাদের দেশে বিদ্যমান যা মানুষ ও জীবন্ত প্রাণী ছাড়াও জড় বস্তুর মধ্যেও ৫টি আবশ্যিক উপাদানের উপস্থিতির কথা বলেছে। এই মূলগত বস্তু পঞ্চতত্ত্ব ধারণ করে আছে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও অন্তরীক্ষকে। এই পাঁচটি প্রধান উপাদানের উপস্থিতি ও পারস্পরিক উপস্থিতির ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটি মিলিত অবস্থানের মানসিকতা অত্যন্ত জরুরি। কেননা এই ভাবনাই পারে আমাদের শারীরিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন সাধিত করতে।

আমি দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি জি-২০-এর সভাপতিত্ব আমাকে এই একাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলতেই পরিচালিত করবে। তাই আমার শপথ হলো এক বিশ্ব, এক পরিবার ও এক ভবিষ্যৎ। কখনও এটি কেবলমাত্র একটি স্লোগান নয়। বিশ্বে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে মানবিক সম্পর্কে যে পরিবর্তন নজরে পড়ছে সেগুলিকে আমরা যৌথভাবে সমর্থন করতে পারিনি। সম্মিলিতভাবে আজ বিশ্বের দেশগুলির হাতে যে সামগ্রী আছে তা সমগ্র বিশ্বের মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত। যে কারণে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমাদের জীবনের কালপর্বটি কখনই যুদ্ধপর্ব তকমা পাওয়ার যোগ্য নয়। তা যেন কখনও এমন ধ্বংসাত্মক না হয়ে ওঠে।

আমার ধারণায় আজকের বিশ্ব তিনটি জ্বলন্ত সমস্যার আক্রমণে নাজেহাল— (১) জলবায়ু পরিবর্তন, (২) সন্ত্রাসবাদ, (৩) মহামারীর সংক্রমণ। এগুলির সমাধান পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে কখনোই হতে পারে না। কেবলমাত্র একসঙ্গে মিলে কাজ করলেই আমরা এর সফল মোকাবিলা করতে পারি। অত্যন্ত সৌভাগ্যজনকভাবে আজকের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের সমগ্র মানবজাতিকে খুব সহজেই পারস্পরিক সমস্যার সমাধানসূত্র বার করতে চটজলদি সাহায্য করতে পারে। বিশাল বিশ্ব আজ যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ধরা দিয়েছে, প্রযুক্তির সেই বিশালত্বের পরিধি কত বিস্তৃত ও ক্ষমতাশালী তা আমাদের বোঝা ও সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সমগ্র মানবতার এক ষষ্ঠাংশের বসবাসকারী বহু ভাষা ও বিচিত্র সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার ও বিশ্বাসের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। সমগ্র বিশ্বেরই একটি ছোটোরূপ। যতদূর জানা যায় বিশ্বের প্রাচীনতম যৌথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে গণতান্ত্রিক পরম্পরা তার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মূল ডিএনএ অর্থাৎ গণতন্ত্রের বীজ এখানে রোপিত হয়েছিল।

(১) গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কোনো বিষয়ে জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো এক তরফা ফতোয়া দিয়ে এখানে কাজ হয় না। লক্ষ লক্ষ মুক্ত কণ্ঠের কলতানের সম্মিলিত সহাবস্থানেই একটি ঐক্যতান সৃষ্টি হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) আজকের ভারত সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুততম গতিতে অগ্রসরমান অর্থনীতি।

(৩) আমাদের নাগরিক কেন্দ্রিক প্রশাসনিক পদ্ধতির মডেল সর্বাপেক্ষা প্রান্তিক নাগরিকের সুখ-সুবিধার দিকেও নজর দিতে ভোলে না। একই সঙ্গে প্রতিভাবান তরুণের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্ফুরণের দেশ সর্বোতভাবে

উৎসর্গীকৃত।

(৪) আমরা জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ওপরতলা থেকে প্রশাসনিক একতরফা নির্দেশের মাধ্যমে দেশ পরিচালনায় বিশ্বাসী নই। যে জায়গায় নাগরিকদের মতামতের বা জনগণের ইচ্ছারই মর্যাদা দিতে বদ্ধ পরিকর।

(৫) সকলেই জানেন আমরা প্রযুক্তিকে কতটা জনমুখী করে তুলেছি। এর ব্যবহার আজ দরিদ্রতম মানুষ ও জনগণের প্রয়োজনীয় বস্তুর বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত শুধু নয় সম্পূর্ণ সর্বজনের গোচরে রয়েছে। সকলকে নিয়ে ও পারস্পরিকতায় আবদ্ধ ও কল্যাণকামী।

(৬) প্রযুক্তির এই সঠিক প্রয়োগ আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে নানান ক্ষেত্রে। তার মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক যোগদান সর্বোপরি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে লেন-দেনের প্রসার উল্লেখযোগ্য।

(৭) এই সমস্ত পরিবর্তনের হাতে কলমে প্রয়োগ ও সাফল্যের কাণ্ডারি হিসেবে অভিজ্ঞতার কারণে ভারত সম্ভাব্য বিশ্ব সমস্যার সমাধানে তার অবিসংবাদিত যোগ্যতা প্রমাণ করার, সঠিক পরামর্শ দেওয়ার ভূমিকা নিতে পারে। জি-২০ দেশের প্রধান হিসেবে কাজের সময় আমরা অন্য দেশগুলির কাছে এই সাফল্যগুলিকে বিষয় নির্দিষ্ট ভাবে বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলির কাছে তুলে ধরতে পারি।

হ্যাঁ, আমাদের জি-২০ দেশের অগ্রাধিকারগুলির প্রয়োগ জি-২০ গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলি ছাড়াও আমরা দক্ষিণ বিশ্বের আমাদের সহযাত্রী দেশগুলির সঙ্গেও আলোচনা করতে পারি। কেননা অধিকাংশ সময়ই তাদের কথায় কেউ কান দেয়নি। আমাদের গুরুত্ব তো একটিই, বিশ্বকে সুস্থ-সুন্দর করে তোলার ওপর। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ব পরিবারের সফল দেশের সঙ্গে সমরসতার সম্পর্ক জাগিয়ে তোলাই আমাদের লক্ষ। একটি সম্মিলিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অঙ্গীকার করাই আমাদের পথনির্দেশ।

(১) এই কাজ করতে গিয়ে ভারতের চিরাচরিত প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পদ রক্ষা করার যে ট্রাস্টিশিপ (প্রকৃতির সম্পদ আমাদের কাছে গচ্ছিত তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ) আমাদের ওপর বর্তেছে তা রক্ষা করতে আমরা পরিবেশবান্ধব জীবনশৈলী পালনের ওপর জোর দেব।

(২) সারা বিশ্বঅঙ্গনে মিলনের ঐকতানকে সফল করতে আমাদের একটিই পরিবারের সমৃদ্ধি সাধনে আমরা সারা বিশ্বে খাদ্য, জমির সার, ওষুধপত্রের সরবরাহ অর্থাৎ আদান-প্রদান নিয়ে কোনো রাজনীতি করব না। যাতে এই ভৌগোলিক অস্থিরতা কোনো মানবিক সমস্যার জন্ম না দেয়। যেমন আমাদের পরিবারের মধ্যে যার প্রয়োজন সবার চেয়ে বেশি তাদের ওপরই আমাদের সর্বদা নজর দিয়ে থাকি।

(৩) আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে একটি নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ও অগ্রগতির আশ্বাস পায় সে জন্য বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসাকে আমরা সর্বদা গুরুত্ব দেব যাতে মারণাস্ত্রের ব্যবহারে ব্যাপক মানব সংহার না হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় ও বিশ্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

ভারতের জি-২০ দেশের নেতৃত্বের অভিমুখ সেই কারণে সকলকে নিয়ে (ইনক্লুসিভ), উচ্চাকঙ্ক্ষী, নির্দিষ্ট কাজ নির্ভর ও সংকল্পবদ্ধ হবে। তাই আমার আবেদন আমরা আক্ষরিক অর্থে সম্মিলিত হয়ে ভারতের এই অধিনায়কত্বকে নিরাময়, সমবেত প্রকাশ ও আশার দিগন্ত উন্মোচন করে তুলি যার নাম মানুষকেন্দ্রিক বিশ্বায়ন।

(জি-২০-র প্রধানপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ)

শোকসংবাদ

বীরভূম জেলার সিউড়ি নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কৃষ্ণগোপাল ঠাকুর গত ২৫ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

* * *

মালদা নগরের প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক তথা কল্যাণ আশ্রমের পূর্বতন কার্যকর্তা বিশ্বনাথ সাহার সহধর্মিণী শান্তি সাহা গত ২৬ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মেদিনীপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক লহর মজুমদার গত ১ ডিসেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ১৯৫৮ সালে মেদিনীপুরে সঙ্ঘকাজের গোড়াপত্তনের সময় তিনি স্বয়ংসেবক হন। প্রথম থেকেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। জেলা কার্যবাহ, বিভাগ কার্যবাহ ও বিভাগ সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁর বাড়িতে শ্রীগুরুজী-সহ বহু প্রবীণ কার্যকর্তা ও প্রচারকের পদার্পণ ঘটেছে। রেখে গেছেন তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও স্বয়ংসেবক।

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন—

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতি বিদ্বেষের পোস্টার

ফের বিতর্কের কেন্দ্রে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)। সেখানে স্কুল অব ইন্টারন্যাশানাল স্টাডিজে (এসআইএস) ভীতি প্রদর্শন ও গুন্ডামি চালানোর অভিযোগ উঠলো বামপন্থী ও নকশালপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। খুব সম্ভব ৩০ নভেম্বর রাতে এসআইএসের দুনম্বর বিল্ডিঙের দেওয়ালে ব্রাহ্মণ-বৈশ্য বিরোধী স্লোগান লেখা হয়। রীতিমতো হুমকির সুরে লাল কালিতে লেখা হয় : 'ব্রাহ্মণ-বৈশ্য তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ো, নয়তো রক্ত ঝরবে।' আবার কোথাও লেখা হয়েছে : 'ব্রাহ্মণ-বৈশ্য তোমরা ছাড় পাবে না, আমরা আসছি।' এই ঘটনায় সারা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, বিশেষ করে উল্লিখিত ওই দুই বর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তারা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইছেন না, হোস্টেলও ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এরই মধ্যে জেএনইউ-এর জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে জেএনইউ ইউনিটের সভাপতি রোহিত কুমারের পক্ষ থেকে এ ধরনের ভীতি-প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা করে সংগঠনের তরফে টুইটে এই ঘটনার নিন্দা করে চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে : 'কমিউনিস্ট গুন্ডারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবাধে ভাঙচুর চালাচ্ছে। তারা স্বাধীন চিন্তাভাবনার অধ্যাপকদের চেম্বারগুলোকে বিকৃত করছে।' এরই পাশাপাশি আরও একটা স্লোগান চোখে পড়েছে, অধ্যাপকদের চেম্বারের দেওয়ালে— 'তোমরা শাখায় ফিরে যাও', যাতে করে আর বুঝতে বাকি থাকছে না এই কুকর্মের পিছনে কারা আর কাদের বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত চলছে। যাই হোক, কমিউনিস্ট গুন্ডাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্কুল অব ইন্টারন্যাশানাল স্টাডিজ অ্যান্ড গ্রিভান্স কমিটির ডিনকে এবিষয়ে তদন্ত করতে ও দ্রুত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ধরনের ভীতি, হুমকি প্রদর্শন অবশ্য জেএনইউ-তে নতুন কিছু নয়। কয়েকমাস আগে এপ্রিলে রামনবমীর সময় ক্যাম্পাসে পুজোর আয়োজন করে একদল জাতীয়তাবাদী ছাত্র। সেই পুজো ভেস্তে দিতে মদ ও মাংস নিয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালায় বামপন্থী ও নকশালপন্থী একদল ছাত্র। ঘটনায় অন্তত ষাটজন জখম হন ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যথেষ্ট আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কয়েকবছর আগে জেএনইউ চত্বরে ভারতীয় সংসদ ভবন হামলায় ফাঁসি হওয়া আফজল গুরুর জন্মদিন পালন ও তাকে ঘিরে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও মনে পড়তে বাধ্য।

তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, জেএনইউতে সুপরিকল্পিতভাবে বর্ণবিদ্বেষের পটভূমি রচনা করা হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রান্দোলনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বরাবরই এই বিশ্ববিদ্যালয় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের দখলে। তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ এবিভিপি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকবার বামপন্থীদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়নি তা নয়, তবে সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। এখানে বামপন্থীরা এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাদের দুটি ছাত্রসংগঠন যথা ভারতীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকারী সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও ভারতীয় গণতন্ত্রে অনাস্থাপ্রদর্শনকারী নকশালদের ছাত্র সংগঠন আইসা (অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশান) পরস্পরের বিরুদ্ধে মক-ফাইট করে ছাত্র-নির্বাচনে লড়ে শাসক-বিরোধী— এই দুই মর্যাদাই ভাগাভাগি করে নিয়ে জাতীয়তাবাদী কণ্ঠকে অবদমিত করতো। এর পাশাপাশি বামপন্থী শিক্ষকদেরও অন্যায্য পক্ষপাতিত্ব লাভ করতো বামপন্থী ছাত্ররা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বামপন্থী ইন্টেলেকচুয়ালদের আঁতুড়ঘর হিসেবে এককালে বিবেচনা করা হতো জেএনইউকে। পার্টির নেতা সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাট থেকে ইতিহাসের অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার---এঁরা জেএনইউয়েরই ফসল।

ছবিটা বদলে যেতে থাকে ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে। বামেদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঙ্গীন হওয়ার পাশাপাশি তাদের সামাজিক প্রতিপত্তিও ক্রমশ হ্রাস পায়। দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জেএনইউতে ক্রমশ জায়গা নিতে থাকে জাতীয়তাবাদী শক্তি। প্রমাদ গোনে বামশক্তি। তাই এতকাল যারা ছাত্রনির্বাচনে আইসা বনাম এসএফআই মক ফাইট বা নকল যুদ্ধ করেছে, তারাও বিপদ বুঝে নির্বাচনে হালে পানি পেতে এককাট্টা হলো। আফজল গুরুর জন্মদিন পালন সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি দেশদ্রোহিতাকেও মদত করতে প্রস্তুত, আর একাজে তারা জেএনইউয়ে বামপন্থী শক্তির পাশে দাঁড়াচ্ছে।

দেশে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির এই মুহূর্তে যা হাল তাতে ঐক্যবদ্ধ হিন্দুশক্তিকে ভাঙতে তাদেরকে বর্ণবৈষম্য, ব্রাহ্মণ্যবাদ, দলিত অত্যাচার ইত্যাদির গল্প ফাঁদতেই হবে। যে অ্যাজেন্ডাকে এতকাল হাতিয়ার করে জেএনইউতে জাঁকিয়ে বসেছিল বামপন্থীরা। সুতরাং ব্রাহ্মণ-বৈশ্যদের হুমকি পোস্টারে নতুনত্ব একেবারেই না থাকলেও জেএনইউয়ের ছাত্রদের পেছনে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী মদতের প্রশ্নটা কিন্তু থাকছেই। আর এই প্রবণতা দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে খুবই উদ্বেগের। □

আন্দোলন আর দাবিতে অধিকারের যে ভাতা সত্যিই মহার্ঘ্য

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

'চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ'— দীর্ঘ ২৬ বছর সরকারি চাকরির পর হতাশ হয়ে বন্ধু শ্রীশ মজুমদারকে চিঠিতে লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, সরকারি চাকুরিজীবীদের সেই বঙ্কিমসুলভ হতাশা চলছেই। কখনও লাঠির আঘাত, কখনও পুলিশের কামড়, কখনও-বা প্রিজন ভ্যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর চোখে প্রাপ্য মহার্ঘ্য ভাতার (ডিএ, ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স) প্রসঙ্গ উত্থাপন মানে তা 'ঘেউ ঘেউ' করা। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক দমকা অসম্মানে পাবলিক প্লেসে সারমেয় করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বকেয়া ভাতা বাকিই রয়ে গেল। মহার্ঘ্য ভাতা চাইতে গেলে জুটছে ঘাড়ধাক্কা। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেও রাজ্য এমনই দৃশ্যের সাক্ষী রইল। ষষ্ঠ বেতন কমিশন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের থেকে ৩১ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা কম পাচ্ছেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। পুলিশ রাজপথেই দৈহিক নির্যাতন করেছে দাবিদারদের। যারা দলদাসের ভূমিকায় লাঠি ব্যবহার করছেন মজার কথা তারাও যে সরকারি কর্মী। মাইনেতে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু একটা পুলিশ-দেশে বঞ্চিত কর্মীদের দাবির আওয়াজ উঠলেই আরও একদল বঞ্চিত পুলিশ কর্মী উত্তরে দিচ্ছে লাঠি, চড় থাপ্পড়, নিগ্রহ। মহার্ঘ্য ভাতা বকেয়া থাকায় ২ বছর আগে অবসরপ্রাপ্ত এক পুলিশকর্মী মাসিক ৯ হাজার টাকা কম পাচ্ছেন, তিনিও আন্দোলনের পথে শামিল হন। প্রাক্তন পুলিশটিও বর্তমান পুলিশের নির্যাতনের শিকার।

সর্বশেষ মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির পর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৩৪ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এতো বঞ্চনা কেন? কেন্দ্রীয় সরকারের মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির ফলে ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার কর্মী এবং ৬৮ লক্ষ ৬৩ হাজার পেনশনভোগী উপকৃত হচ্ছেন। এ মুহূর্তে রাজ্যের মহার্ঘ্য ভাতার পরিমাণ মাত্র ৩ শতাংশ। যদি আয়ের ভিত্তিতে নিম্নতর বেতনের একজন রাজ্য সরকারি কর্মচারীকে গণ্য করি, যার মাসিক বেতন ১৭ হাজার টাকা, তার ক্ষেত্রে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে আনুমানিক ৬৩ হাজার ৫৮০ টাকা। এর থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে রাজ্য সরকার তার কর্মচারীদের কী হারে বেতন অসাম্যের সম্মুখে রেখেছে।

এ গল্প আজকের নয়। ২০১৬ সাল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ভিতর অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। মহার্ঘ্য ভাতা ১২৫ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ায় ২০১৬-এর ১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করে। নতুন বেতন কমিশনের বর্ধিত বেতনের ওপর ২০১৬-র ১ জুলাই ২ শতাংশ হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেয় কেন্দ্র। এবং এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বেতনের এতোটাই স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যা তাদের ধৈর্যের আসন থেকে ধীরে ধীরে চ্যুত করতে থাকে। যদি সেই বছরের দিকে ফিরে তাকাই, তবে যখন একজন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীর মহার্ঘ্য ভাতার ব্যবধান ছিল ৪৭ শতাংশ। ২০১৯-এর ১ জানুয়ারি ১২৫ শতাংশ হারে মহার্ঘ্য ভাতা পাবো পাবো করছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, আর ঠিক ততক্ষণে নতুন পে স্কেলে আরও এক দফা মহার্ঘ্য ভাতার মুখ দেখেছিল কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা। ২০১৬-তে যখন অসন্তোষের বীজ বপন হচ্ছিল এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তখন একজন রাজ্য সরকারি কর্মীর বেতন যদি ১০০ টাকা হয় তবে সেই পদের কেন্দ্রীয় কর্মচারীর বেতন ২৫৭ টাকা! এই বৈষম্য দীর্ঘ সময় হজম করছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। কিন্তু

রাজ্যের 'দিচ্ছি দেব' সুরের শেষ আর হচ্ছিল না। ২০১৭-তে যখন ৩১ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা বকেয়া ছিল তখন সরকারি কর্মচারীরা মামলা দায়ের করেছিল। যে মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মেটানোর পক্ষেই রায় দান করেন। সঙ্গত প্রাপ্যের দাবিতে কোমর বেঁধে সবাই নেমেছেন। এ বছরের ২০ মে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা মেটানোর নির্দেশ দেয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। সে রায়ের মান্যতা দেয়নি রাজ্য সরকার। তারা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালে তাও খারিজ হয়। বকেয়া টাকা আজও জোটেনি এ রাজ্যের কোষাগার ভরাট করা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের।

ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে এই মামলা এখন অপেক্ষারত। রাজ্য সরকার যে কী সাবলীল মিথ্যাচার করতে পারে তা মহার্ঘ্য ভাতার দাবি না উঠলে পুনঃপ্রমাণিত হতো না। মহার্ঘ্য ভাতার কথা উঠলেই --- রাজনৈতিক মঞ্চ, সাংবাদিক সম্মেলন থেকে একটাই কথা শোনা যায়, রাজ্যের হাতে টাকা নেই। তাহলে পুজোর সময় ক্লাবের অনুদান ৫০ হাজার থেকে বেড়ে ৬০ হাজার হয় কেমন করে? কোন গৌরী সেন সে টাকা বরাদ্দ করল! এক পুজো অনুদানেই রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ২৫৮ কোটি টাকা। এর পরেও আছে কার্নিভাল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, মেলা-খেলা-মোচ্ছব। ভাটা নেই কোনো আমোদেই। শুধু কর্মীদের প্রাপ্য বেতনের কথা বললেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে সরকার পক্ষ। আরও অবাক কাণ্ড, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন রাজ্য সরকার হলফনামা পেশ করেছে, তখন উল্লেখ করছে কোনো মহার্ঘ্য ভাতা বাকি নেই। এতো বড়ো মিথ্যাচার যে আইনের ময়দানেও করা যায় সে রেকর্ড এই রাজ্য সরকারই করল। অন্যান্য কোনো রাজ্যের মহার্ঘ্য ভাতার হাল এ রাজ্যের মতো বেহাল নয়। ২০২০-র ১ জুলাইয়ের হিসেব অনুযায়ী কেরল সরকারি কর্মচারীরা ৩৬ শতাংশ হারে, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ ৩৪ শতাংশ (২০২২, ১ জুলাই), উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র ৩১ শতাংশ (২০২২, ১ জুলাই), ছত্তিশগড় (২০২২) ও ঝাড়খণ্ড ২৮ শতাংশ (২০২০), কর্ণাটক ২৭.২৫ শতাংশ (২০২২), অন্ধ্র প্রদেশ (২০২২) ৩৮.৭৭ শতাংশ, হরিয়ানা ২৮ শতাংশ (২০২১), অসম (২০২২) ৩১ শতাংশ, অরুণাচলপ্রদেশ (২০২২) ৩৪ শতাংশ হারে, পঞ্জাব (২০২১) ২৮ শতাংশ হারে, ওড়িশা (২০২২) ৩৪ শতাংশ, তেলেঙ্গানা (২০২২) ১৭.২৯ শতাংশ হারে, ২০২১-এ হিমাচলপ্রদেশ ৩১ শতাংশ হারে, মিজোরাম (২০১৯) ১৭ শতাংশ হারে, মেঘালয় (২০২১) ২২ শতাংশ, গোয়া ও উত্তরাখণ্ড (২০২২) ৩৪ শতাংশ, এমনকী কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানেও (২০২২) ৩৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেয় রাজ্য সরকার। এছাড়াও বিজেপি শাসিত গুজরাট (২০২১) ২৮ শতাংশ, বিহার (২০২১) ২৮ শতাংশ একই বছর নাগাল্যান্ড ৩১ শতাংশ, মণিপুর (২০২২ জুন) ২১ শতাংশ, ত্রিপুরা ৮ শতাংশ এবং সিকিম (২০২১ জুলাই) ৩১ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতার কথা ঘোষণা করা হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ যদি উৎসবে আয়োজনের ত্রুটি না রেখে কেবলমাত্র সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য অর্থে আঘাত দিয়ে দিনের পর দিন মোচ্ছব, দান খয়রাতির রাজনীতি করে তখন তা রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতা দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয়।

কলকাতা হাইকোর্টে যখন মহার্ঘ্য ভাতা মামলা চলছে তখন এক নির্লজ্জ অধ্যায় ঘটেছিল। ট্রাইব্যুনালে এবং হাইকোর্টেও একই প্রশ্নের মুখোমুখি রাজ্য, কেন কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া যাচ্ছে না? বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ যখন এ প্রশ্ন তীব্রভাবে করেন তখন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল উত্তরে বলেছিলেন, 'ডিএ সরকারি কর্মচারীদের আইনসঙ্গত অধিকার নয়'। এমনকী গোড়ার দিকে ট্রাইব্যুনালে বিচারপতি এও বলেছিলেন মহার্ঘ্য ভাতা রাজ্যের 'দয়ার দান'। অর্থাৎ রাজ্য চাইলে দিতেও পারে আবার নাও পারে। তারপরেই একটা হেস্তনেস্ত করতে মাঠে নামে সরকারি কর্মচারীরা। যত শুনানি হচ্ছে ততবারই রাজ্য সরকার সজোরে বোল্ড আউট হচ্ছে। রাজ্য সরকারও জানে এ মামলা কোনোদিনই তাদের পক্ষে পালে হাওয়া পাবে না। কিন্তু যত বছর ধরে এই বিপুল বরাদ্দের অর্থ স্থগিত রাখা গেল তত বছর এক মুষ্টিমেয় সরকারি কর্মচারী শ্রেণীকে (ভোটারের পরিসংখ্যায়) বঞ্চিত রেখে সেই টাকা হয়ে গেল গৌরী সেন। যে গৌরী সেন খেলা মেলা সব করল। অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের ভোট কিনল।

বাংলা ১২৭৩, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর ১৮৬৬) থেকে মাসিক দশ টাকা বেতনে নীলকমলবাবু রবি ঠাকুরকে পড়ানো শুরু করেছিলেন। চার বছর চলেছিল সে পর্ব। ১২৭৫-এ অর্থাৎ দু' বছরের মাথায় তাঁর বেতন দু' টাকা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছিল। এটা সেই বাঙ্গালির মাটি যেখানে এই ইতিহাস লেখা আছে কিন্তু একজন কর্মচারীর প্রাপ্য কেমন করে দিতে হয় তা জানল না 'সংস্কৃতিমনা' সরকার।

এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বর্তমান দশা ঠিক যেন, 'যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।' □

With Best
Compliments from -

A
Well Wisher

পশ্চিমবঙ্গ আজ মাদক কারবারিদের মুক্তাঞ্চল

সঞ্জীব দে

আজও ঘটা করে ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস বা নেশা মুক্ত দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আজ দেশে-বিদেশে বহু মাদক বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠেছে, তারা গণসচেতনা গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে মাদকমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে। পশ্চিমবঙ্গের মাদক বিরোধী সংগঠনগুলি নেশামুক্ত সমাজের আশায় আজও পথে নামে ওই দিনটিতে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের উদাসীনতায় নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য সহজেই পৌঁছে যায় গৃহস্থের অন্তঃপুরে। উদ্বেগের আরও বড়ো কারণ হয় যখন রাজ্যের ঢিলেঢালা আইন ব্যবস্থার হাত গলে নিষিদ্ধ মাদক পৌঁছে যায় স্কুল-কলেজের দোরগোড়ায়।

বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ মাদক কারবারিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। মালদা, মুর্শিদাবাদের মতোই অবৈধ কারবারে বারবার উঠে আসছে নদীয়া, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনার নাম। গত নভেম্বরের প্রথমে দুর্গাপুরে অণ্ডাল থানার ডায়মন্ড মোড়ে নাকা চেকিঙে একটি গাড়ি থেকে প্রায় দু-শো গ্রাম হেরোইন-সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে অণ্ডাল থানার পুলিশ।

রাজ্যের শুল্ক দপ্তর গত জুলাই মাসে কলকাতার খিদিরপুরে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আড়াই কেজি হেরোইন উদ্ধার করে, যার বাজার মূল্য দশকোটি টাকারও বেশি, গ্রেপ্তার দুই যুবক। এই মাদকের অনেকটা অংশ হাত ঘুরে পৌঁছে যেত শহরের স্কুল, কলেজে। মাদক ঘটিত বেশ কয়েকটি ঘটনার মধ্যে অন্যতম ছিল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের মাদক কাণ্ড। গ্রেপ্তার হয়েছিল চক্রের মক্ষিরানি সাজিনা বিবি, উদ্ধার হয়েছিল ২ কেজি মাদক, যার বাজার মূল্য ১ কোটি টাকা। সূত্র ধরে খুঁজে গ্রেপ্তার করা হয় সাজিনা বিবির সহকর্মী সাইমা বিবিকে। তার কাছ থেকেও উদ্ধার হয় প্রায় সমপরিমাণ মাদক। মাদকগুলো নদীয়া থেকে এনে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার স্কুল-কলেজগুলোতে ঢোকাবার মতলবে ছিল। কলেজ ছেড়ে স্কুলের দরজায় মাদক পৌঁছে যাবার মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা আগেও ঘটেছে। অথচ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রাজ্য প্রশসন।

২০২০ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় ইয়াবা-সহ গ্রেপ্তার হয় তৃণমূল নেতা তথা মালদার কালিয়াচক ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অতিউর রহমান। সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে ফকির আহমেদ, জিয়াউর রহমান, আমিরুল শেখ-সহ আরও বেশ কয়েকজন। উদ্ধার হয়েছিল ১৩ কেজি ৬৮৬ গ্রাম হেরোইন যা রঙিন মোড়কে মুড়ে পৌঁছে যেত শহরের নামিদামি স্কুলগুলিতে। মাদক উদ্ধার করেছিলেন কলকাতা স্পেশ্যাল টাস্কফোর্সের গোয়েন্দারা। সব ছাড়িয়ে যে খবরটি অবাক করেছিল তা হলো, ২০২০-র মার্চে কলকাতার তালতলা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয় এক মহিলা মাদক বিক্রেতা। তিনি আবার কলকাতার স্কুলের দোরগোড়াতেই কারবার ফেঁদে বসেছিলেন। কলকাতা পুলিশের নারকেটিক্স সেল তদন্তে ওই মহিলার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল কোন কোন স্কুলে মাদক বিক্রি হতো, কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী সেই মাদক সেবন করতো? তারপর সেই ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করে কাউন্সেলিং করার কথা ছিল। বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের নামিদামি স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সব দায় ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। কথায় বলে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস। বন্ধু-বান্ধব বা তার পরিচিতরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সে তার সঙ্গীকে নেশার জগতে টেনে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর নেশার দ্রব্যটি যদি হাতের কাছেই পাওয়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের এক উল্লেখযোগ্য অংশ আজ সর্বনাশা নেশার কবলে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের শুরুতে নেশার কবলে পড়ে হারিয়ে ফেলে তাদের বোধবুদ্ধি, ধরে রাখতে পারে না ভালো আদর্শ, তখন মূল্যবোধ হয়ে যায় মূল্যহীন। তাদের চিন্তা ও চেতনায় ঠাঁই পায় শুধুই মাদক, আর তাই দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে মগ্ন হয় উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে। বহু বাবা-মাকে অসহায়ভাবে আজ শরণাপন্ন হতে হচ্ছে মনস্তত্ব বিশারদ ও সংশোধন ব্রতী একশ্রেণীর চিকিৎসকের কাছে। এক শ্রেণীর হীন-মানসিকতার অর্থলোভী মানুষ ফেঁদে বসেছে মাদকের এই রমরমা কারবার। ড্রাগ দূরিকরণে প্রশাসনিক উদাসীনতা কাম্য নয়। প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে আজও প্রকাশ্যেই মাদক দ্রব্য কেনা-বেচা হচ্ছে। সচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা খুব সহজেই নেশার টাকা জোগাড় করে নিচ্ছে, তারা অভিভাবকদের অন্ধকারে রেখে আকৃষ্ট হচ্ছে ড্রাগের প্রতি। অভিভাবকদের আরও সতর্ক থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে বন্ধুর সঙ্গে মতো মিশতে হবে।

তাদের প্রতিটি কার্যকলাপের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে, এমনটাই মত মনোবিদদের। ভারতবর্ষে প্রতিদিন ৬ লক্ষেরও বেশি শিশু সঙ্গদোষে ধূমপান করে, সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান থেকে এমন তথ্য সামনে এসেছে। ভারতে ধূমপায়ীদের সংখ্যা যে বাড়ছে এ বিষয়ে গবেষকরা নিশ্চিত ছিলেন। আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির করা এক সমীক্ষায় জানা গেছে ভারতে প্রতি সপ্তাহে ধূমপানের জন্য মারা যায় ১৭,৮৮৭ জন।

যদিও নেশার বস্তু হিসেবে মদ আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বেশ কিছু মুসলমান প্রধান দেশে মদ নিষিদ্ধ। ভারতবর্ষে গুজরাটের পর বিহারে মদ নিষিদ্ধ। এক সময় দুনিয়া জুড়ে গাঁজার কদর ছিল সবচেয়ে বেশি। আজ বিশ্বের বেশ কিছু দেশে বিনোদনমূলক সামগ্রী হিসেবে গাঁজাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গাঁজা মূলত পাহাড়ি গাছ, হিমালয়ের পাদদেশে তার জন্ম বলেই অনুমান করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসে গাঁজাকে পবিত্র ঘাস বলা হয়েছে। ভগবান শিবের পূজায় আজও গাঁজাকে নৈবেদ্য রূপে দেওয়া হয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিমিত গাঁজা সেবনে কিছু গুণের কথা বলা হয়েছে। যেমন, একাগ্রতা বাড়ানো, ব্যথা-বেদনা দূর করা ইত্যাদি। মাত্রারিক্ত গঞ্জিকা সেবনে স্মৃতিভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রবল। নেশার ইতিহাস প্রাচীন হলেও আজ বিজ্ঞানের উন্নতি ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ পাল্লা দিয়ে উদ্ভাবন করেছে নতুন নতুন নেশা। আজ অনেক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো ড্রাগের নেশা। এর মধ্যে অত্যধিক ক্ষতিকারক নেশার বস্তুগুলো হলো, ইয়াবা ট্যাবলেট, হেরোইন, কোকেন, হাসিস, মারিজুয়ানা, ম্যানড্রেকস, এলএসডি, ব্রাউন সুগার, গাঁজা, ভাং ও ফেনসিডাইল ইত্যাদি।

এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মাত্র পাঁচ গ্রাম হেরোইন কারুর শরীরে তিনবার প্রয়োগ করলে সে মানুষটি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না। থাই ভাষায় ইয়াবা ট্যাবলেটকে বলা হয় 'পাগলা ওষুধ।' তার মানে নেশায় আসক্ত ব্যক্তিটি পাগলের মতো আচরণ করবে। এসব ছাড়িয়ে বাংলাদেশে যে নতুন নেশার দ্রব্যটির খোঁজ পাওয়া গেছে তার নাম, 'ক্রিস্টাল মেথ বা আইস। বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক খুরশিদ আলম জানিয়েছেন, 'এই ক্রিস্টাল মেথ মাদকটি ইয়াবা, হেরোইন থেকেই প্রসেস করে তৈরি হয়েছে, এটি ইয়াবার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর নিয়মিত সেবনে হতে পারে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, মানসিক অবসাদ— এমনকী আত্মহত্যার ঝুঁকিও যথেষ্ট।' কথায় বলে ড্রাগের নেশা সর্বনাশা।

পশ্চিমবঙ্গ আজ মাদক চোরাচালান কারবারীদের মুক্তাঞ্চল, তারা যেন ভয়ডরশূন্য, তারা এক প্রকার নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে তাদের এই অবৈধ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। এর সব থেকে বড়ো উদাহরণ যা ভাবনারও অতীত। গত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে খোদ কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় চার কলেজ পড়ুয়াকে। কলকাতা পুলিশের এসটিএফের একটি দল নিউটাউনের আকাঙ্ক্ষা মোড় থেকে গ্রেপ্তার করে সামশের জোহা, ফারহান শেখ, মহম্মদ নাঈম ও মৌসুমি খাতুনকে। পড়ুয়াদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩০০ গ্রাম হেরোইন। তার ঠিক এক মাস পরে মার্চে খোদ কলকাতার গার্ডেনরিচ থেকে সাড়ে সাত কোটি টাকার হেরোইন-সহ দম্পতি জওহর ইমাম ও নিশরজা বিবিকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স। এদের কাছে মাদক দ্রব্য আসতো মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া থেকে। সেই সূত্র ধরে লাল বাজারের গোয়েন্দারা প্রায় ছয় লক্ষ টাকার মাদক-সহ গ্রেপ্তার করে ওই দম্পতির দুই শাকরেদ কওসর শেখ ও সুদীপ সরকারকে। গোয়েন্দারা বলেন, কলকাতা শহর জুড়ে মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছিল এই দম্পতি।

সর্বোপরি মাদক দ্রব্যের চোরাই অনুপ্রবেশ বন্ধ করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল রাজ্য প্রশাসনের। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাজ্য অসম সরকারের কথা না বললেই নয়। নেশামুক্ত সমাজের লক্ষ্যে মাদক দূরীকরণে প্রতিবেশী রাজ্য অসম সরকারের পদক্ষেপ ছিল দৃষ্টান্তমূলক। ২০২১-এর জুলাই মাসে যা করে দেখালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা। নিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে ১৬৩ কোটি টাকার মাদকের উপর বুলডোজার চালিয়ে দিলেন। নগাঁও জেলার বড়মপুর রঙ্গাজান স্টেডিয়ামে আয়োজিত কর্মসুচিতে বাজেয়াপ্ত করা ৩৬ কোটি টাকার মাদক দ্রব্য আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার নিজের কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করেছেন, যুবকদের মধ্যে যারা মাদক সরবরাহ করছে তাদের রেয়াত করা হবে না, পুলিশকে মাদক চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ধরতে না পেরে পায়ে গুলি মারতেও হয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গে হিংসা, ধর্ষণ, অরাজকতার খবর একের পর এক সামনে এসেছে। নেশাগ্রস্ত ছেলের হাতে খুন হতে হয়েছে বাবা, মাকে। এমনই একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর শহরের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায়। মাদকের নেশা থেকে আটকাতে গিয়ে ভাইয়ের হাতে খুন হতে হয় দাদাকে। ছোটো ভাইকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার পরিণতি যে এতো ভয়ানক হবে তা ভাবতে পারেনি পরিবারের কেউ।

মাদকের নেশায় আসক্ত যুবকেরা নেশার দ্রব্য সংগ্রহের জন্য চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এই মাদক কারবারীদের ঘৃণ্য জাল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক ড্রাগ চক্রের পাণ্ডাদের সহজ লক্ষ্য যুবসমাজ। কারণ যুবকেরা অতি সহজেই সাময়িক আনন্দের খোঁজে ও অজানা অনুভূতির টানে জড়িয়ে পড়ে নেশার জালে। যে কোনও দেশের তরুণ প্রজন্মকে পঙ্গু করে দেওয়া মানে সে সেদেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। সমাজ অধঃপতনের পথে গেলে শুধুমাত্র লাভবান হয় ছলেবলে টিকে থাকা মতলবি সরকার ও তার দলবল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের সুনাগরিকদের একটা দায় থেকেই যায়। অথচ পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে সুস্থ, সবল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন, প্রতিবাদ নজরে আসেনি কোনোদিনও। যারা জাতির হাল ধরবে তারাই যখন কুরুচিকর পরিচয় দেয় তখন উদ্বেগের কারণ থাকে যথেষ্ট।

মনে পড়ে ২০১৯-এর ডিসেম্বরের খবরটি যখন বাইরে এল সেদিনও নির্বিকার ছিল লোভী, ভীরু বুদ্ধিজীবীর দল। সে খবরটি সারাদিন ধরে এবিপি আনন্দ সম্প্রচার করেছিল, 'মাদক কারবারীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে যাদবপুর কলেজ ক্যাম্পাস। সূর্য ডুবলেই মাদক সেবনের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিলের ধার, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, চাতাল, আশেপাশে সক্রিয় ড্রাগ চক্র, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বহিরাগতরা।' হ্যাঁ সেদিনও এটা শুধু খবর ছিল, কোনো চ্যানেলে বসেনি প্যানেল, হয়নি কোনো চর্চা। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, 'এই পৃথিবী কখনো খারাপ মানুষের খারাপ কর্মের জন্য ধ্বংস হবে না, ধ্বংস হবে খারাপ মানুষের খারাপ কর্ম দেখে যারা চুপ থাকেন তাদের জন্য।' □

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন কেন দরকার ?

তাপস দে

বাংলাদেশে নাকি কোনো বড়ো অপরাধ হয় না, তাই পুলিশের চাকরি বেশ আরামের। সেজন্যেই ঝুমন দাশ ইসলাম অবমাননার দায়ে আবারও কারাগারে। সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুলে চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈরি অপূর্ব নির্মাণশৈলীর নবরত্ন মন্দিরের বাইরের গেটে মসজিদের জন্য দানবাক্স লাগালে আমারও রাগ হতো। ঝুমন দাশ তাই নিয়ে রেগে ফেসবুকে দু-চার লাইন লিখেছেন। ব্যাস, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের দায়ে থানায় চালান। ইসলাম অবমাননা ঠেকাতে যিনি দানবাক্স লাগিয়েছেন তাকেই প্রথমে দানবাক্স সরাতে বাধ্য করা দরকার ছিল। বাক্স লাগানোর কি জায়গার অভাব? বেছে বেছে মন্দিরের গেটে! ঝুমন দাশের লেখাকে হিন্দুদের অভিযোগ হিসেবে নিতে পুলিশের সমস্যা কোথায় ছিল?

কিন্তু এইসব ঘটনার সঙ্গে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের কী সম্পর্ক? সুরক্ষা আইনের সফল বাস্তবায়ন হলে এসব সাধারণ অনুভূতির আঘাতের ঘটনা থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু অত্যাচারের অপরাধের বিচার হবে। সবাই বোধহয় একমত হবেন যে বাংলাদেশে এবং অন্য দেশে, মানুষের বিভিন্ন পরিচয়ের জনগোষ্ঠী নানা কারণে অত্যাচারিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। যেমন হরিজনরা তাদের হরিজন হবার কারণে, মেয়েরা মেয়ে হবার কারণে, জনজাতিরা জনজাতি হবার কারণে, হিন্দু হিন্দু হবার কারণে।

বাংলাদেশের গণ্ডীর বাইরে, ইহুদিরা ইহুদি হবার কারণে (আমরা ৯০-এর দশকে 'গোলাম আজম-সাঈদি, বাঙ্গলার ইহুদি' স্লোগান শুনেছি। রাজনীতির স্লোগানের সীমিত এলাকার বাইরে ইতিহাস নিয়ে যারা সামান্য পড়াশোনা করেন, তারা ইহুদিদের হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীতে অত্যাচারিত হবার ইতিহাস জানেন।) কালোরা কালো হবার কারণে, চেরোকিরা চেরোকি হবার কারণে, সমকামীরা সমকামী হবার কারণে, খ্রিস্টানরা সময় সময় এবং কোথাও কোথাও খ্রিস্টান হবার কারণে এবং সম্প্রতি কোথাও কোথাও মুসলমানরা মুসলমান হবার কারণে। কাজেই মানুষের দীর্ঘকালের ইতিহাসে গোষ্ঠী পরিচয়ের কারণে একগোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার করেছে। এর অনেকগুলো ধর্মীয়, জাতিগত, নারী-পুরুষ এবং যৌন পরিচয়ের কারণে। এসব অত্যাচারের মূলে রয়েছে ঘৃণা। এই ঘৃণার কারণেই একজন অপরাধী সম্পূর্ণ অপরিচিত আরেকজনের উপর শুধু তার বিশেষ পরিচয়ের কারণে অত্যাচার করে। আর এই ঘৃণার উৎস ও প্রেরণা মানুষের অনেক কাজের মতোই বিচিত্র ও বিসদৃশ। প্রতিটি গোষ্ঠী বা সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্য না থাকলে গোষ্ঠীর আলাদা পরিচয় থাকে না। বৈশিষ্ট্যকে উসকে, ঘৃণার আবহ তৈরি করে, প্রতিরোধে অক্ষম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধের উপযুক্ত পরিবেশ এবং শেষ পর্যন্ত অপরাধ যেন কেউ করতে না পারে, এটি দেখা সরকারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আইনটির কি আদৌ কোনো প্রয়োজন

আছে? বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্তিত্বহীনতায় ভুগেছে এবং ভুগছে। ১৯৭৪ সালের জনগণনায় বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৩ ভাগ এবং ২০২২ সালের জনগণনায় তা হয়েছে ৮ ভাগের কিছু কম। ৪৮ বছরে হিন্দু কমেছে ৫ ভাগ। পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে গত ৪৮ বছরে মুসলমান বেড়েছে প্রায় ৯ কোটি আর হিন্দু সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৪ লক্ষ! সচেতন সংখ্যালঘুরা মনে করে যদি সরকার আন্তরিক হয়ে কিছু না করে তবে আগামী ৩০ বছরের মধ্যেই তারা নিজের মাতৃভূমি থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে এবং এই ধারণা একেবারেই অমূলক নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অর্পিত সম্পত্তি আইন যার মাধ্যমে হিন্দুদের সম্পত্তি ব্যাপকভাবে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাতছাড়া হয়েছে, এটি ছিল একটি বড়ো কারণ। প্রায় নিয়মিতভাবে 'ইসলাম বিপন্ন' হওয়ার অজুহাতে পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং তার বিচার না হওয়া আরেক কারণ। রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের নিয়মিত সংখ্যালঘু অত্যাচারের বাস্তবতা এড়িয়ে 'বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বিদ্যমান', 'ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে কেউ কোনোদিন বাংলাদেশ ত্যাগ করেনি' এই মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরি ও প্রচার, অর্থাৎ সত্য গোপন করা— এগুলোই মূল কারণ। আমরা মনে করি, সংখ্যালঘু নিরাপত্তা আইনে সংখ্যালঘু ঘৃণা প্রসূত অপরাধের জন্য প্রতিক্ষেত্রে একই ধরনের অপরাধের চেয়ে বেশি শাস্তি অপরাধীকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বাড়িতে আগুন দেওয়ার অপরাধ প্রমাণিত হলে, ঘৃণাপ্রসূত হওয়ার কারণে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা আইনে শাস্তি বেশি হবে। কারণ তার করা অপরাধ শুধু একজন ব্যক্তি বিশেষের উপর নয়, সেটি একটি সম্প্রদায়ের উপর, এজন্য এই অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশি এবং তার শাস্তিও সমানুপাতিক হওয়া প্রয়োজন।

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। ছোটো শিশু বড়ো হবার সময় মা-বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সবাই খেয়াল করেন শিশুটি ঠিকমতো বড়ো হচ্ছে কিনা। মানে শিশুটি ওজনে বাড়ছে কিনা, সে লম্বা হচ্ছে কিনা এবং বড়ো হওয়ার সঙ্গে তার বুদ্ধি ঠিকমতো খুলছে কিনা। নিয়মিত না মাপলে কোনো জিনিস ঠিকঠাক চলছে কিনা বোঝা যায় না। কাজেই এই আইনেও সবার প্রথমে আমাদের দরকার একটি মাপার ব্যবস্থা। এর নাম দেওয়া যেতে পারে সংখ্যালঘু ঘৃণা গণনা আইন। উদ্দেশ্য হলো— কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে সেটি সংখ্যালঘু ঘৃণাপ্রসূত কিনা তা ঠিক করা এবং তা লিপিবদ্ধ করে বার্ষিক প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশ করা। ধারণা করা যায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যায় পড়বেন। কারণ ঘৃণার অংশ বাদ দিলে এটি দেখতে অন্য অপরাধের মতোই। সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় হলো যেসব সংগঠন সংখ্যালঘুদের নিয়ে এবং সংখ্যালঘুদের জন্য কাজ করে তারা নিয়মিত সংখ্যালঘু অপরাধের রিপোর্ট তৈরি করবেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানাবেন কেন কোনো অপরাধ সংখ্যালঘু ঘৃণা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে বা হয়নি। সম্ভাব্য সমস্যাটি মনগড়া নয়। আমেরিকায় ৮০-র দশকে যখন প্রথম ফেডারেল ও স্টেট হেট ক্রাইম 'ল তৈরি করার কাজ শুরু হয়, সে ব্যাপারটি এভাবেই সমাধান করা হয়েছিল।

আসি তদন্ত ও বিচার প্রসঙ্গে। আমরা মনে করি সংখ্যালঘুদের উপর সংঘটিত অপরাধের তদন্তের জন্য সরকারের আলাদা পুলিশবাহিনী আর বিচারের জন্য আলাদা কোর্ট প্রয়োজন। এই ব্যাপারটাকে একটি সমস্যা হিসেবে না দেখে জনপ্রশাসন সংস্কারের উপায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। আমরা জানি দীর্ঘসূত্রতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পুলিশ বাহিনীর অধিকাংশ তদন্তই সময়মতো সম্পন্ন হয় না। এবং সম্পন্ন হলেও যারা ভুক্তভোগী তারা সেই তদন্তেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না। ক্ষমতাবানরা যেন তদন্ত প্রভাবিত করতে না পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের যেসব ঘটনার পুলিশি তদন্তের প্রয়োজন সেজন্য নতুন সংস্থা গঠন করলে সেটি সবদিক থেকে ভালো হবে। সংস্থাটি গঠন করার সময় যাতে এটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা যায় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। সবেমাত্র মানুষের সেবার আদর্শে যারা পুলিশে যোগ দিয়েছে আর অভিজ্ঞ, সৎ ও দক্ষ হিসেবে যাদের বাহিনীতে সুনাম আছে তাদের নিয়ে এই নতুন বিভাগ তৈরি করা দরকার। দেশের অধিকাংশ কোর্টে কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি। কাজেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক দিয়ে এমন একটি বিশেষ কোর্ট করা যায় যা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করবে। মোবাইল কোর্ট হলে বোধহয় ভালো হয়— মানে বিচার ব্যবস্থা নিজেই যেন অত্যাচারিতের দুয়ারে পৌঁছায়। এই বিশেষ কোর্ট এবং বিশেষ বাহিনীর কাজকর্ম যদি ভুক্তভোগীদের সন্তুষ্ট করে তবে এই নতুন প্রক্রিয়া অন্যসব পুলিশ বাহিনী এই কোর্টে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

'শত্রু সম্পত্তি আইন' বাতিলের মাধ্যমে সরকার স্বীকার করে নিয়েছে যে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' একটি কালাকানুন ছিল। একইভাবে 'মহিলা ও শিশু নির্যাতন বন্ধ আইন' পাশ করার মাধ্যমে সরকার স্বীকার করে নিয়েছে যে মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচার হয় এবং তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কাজেই যে কোনো আইন তৈরিতে সরকারের একটি মেনে নেওয়ার ব্যাপার থাকে। সরকার যদি মেনে নেয় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হয়, শুধুমাত্র তখনই তারা সংখ্যালঘু নিরাপত্তায় কিছু করবে আশা করি।

সংখ্যালঘু উৎপীড়নের ছোটো ঘটনা নিশ্চয়ই আপোশে মীমাংসা করা সম্ভব। কিন্তু কোন অপরাধ আপোশে মীমাংসা করা যাবে আর কোনটা যাবে না এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা এই আইনে থাকা উচিত। আইন বাস্তবায়নের আগে মসজিদ-মন্দির, টিভি ও ফেসবুকে সরকারের উচিত হবে ভালোভাবে প্রচার করা।

সবশেষে বলা যায়, সরকারের আন্তরিকতার উপরই সবকিছু নির্ভর করে। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বাস করতে পারেনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে এবং পদ্মাসেতু তৈরি হবে, কিন্তু সরকারের আন্তরিকতার কারণে তা শেষ পর্যন্ত হয়েছে। সরকার যদি এই আইন এবং তার বাস্তবায়নের জন্য আলাদা পুলিশ বাহিনী ও কোর্ট তৈরি করে আর আন্তরিকতার প্রমাণ হিসেবে রাজনৈতিক দলের উচ্চপর্যায়ের কোনো নেতা যিনি সংখ্যালঘুদের অত্যাচারে জড়িত থাকেন না, তাঁদের আইনের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধের বিচার করে, তাহলে হিন্দুরা নিজেদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ মনে করবেন। আর সরকারের দায়িত্বশীলরা নিজেদের বিবেক ও প্রয়োজনে বিশ্বকে বলতে পারবেন যে এ বিষয়ে আমাদের যা করার তা আমরা করেছি।

(লেখক ইউএসএ-র প্রবাসী বাংলাদেশি)

দেশ ও জাতির বিকাশে অস্ত্র ও যুদ্ধনৈপুণ্য অনিবার্য শর্ত

মলয় দাস

'যুদ্ধ ও অস্ত্র কোনো সমস্যার সমাধান নয়'— এরকম একটি ধারণা গত শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় হতে ভারতীয় ধ্যানধারণায় গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং এখনও এরকম একটা ভাবনার বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকে। বাস্তবে, এই ধারণাটি তাত্ত্বিকভাবে ও ঐতিহাসিকভাবে ভ্রান্ত। এই ধারণার যে মোটেই প্রায়োগিক সত্যতা নেই, অতীত ইতিহাসে এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসে বারবার তা প্রমাণিত। এই ধারণার বিপরীত ধারণা তথা একটি রাষ্ট্রের বা জাতির উন্নত সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধনৈপুণ্য জনজীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধির সহায়ক— সেটাই ঐতিহাসিক সত্য। এর সব থেকে আদর্শ উদাহরণ ভারতবর্ষ এবং তার ইতিহাস। আমরা যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখি, দেখবো প্রাচীন সাম্রাজ্য যেমন মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, চোল, চালুক্য, পল্লব, রাজকুট, অহোম, প্রতিহার ইত্যাদি যতদিন সামরিকভাবে শক্তিশালী ছিল, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা স্থিতিশীল ছিল এবং শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আর্থিক সমৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি ঘটেছিল।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিক উন্নতির এক অসাধারণ ইতিহাস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'A History of Hindu Chemistry– From the earliest times to the middle of the sixteenth century, A.D., with Sanskrit texts, variants, translation and illustrations.' (Vol-1 & Vol-2)। দুই খণ্ডের এই বইটিকে 'প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা এবং অবদান সম্পর্কিত অসাধারণ অনবদ্য ঐতিহাসিক দলিল' বললে কম বলা হয়। একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো, তৎকালীন সময়ে কীভাবে ভারতীয় সমাজ এবং তার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা নিজেকে মেলে ধরেছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ঋষি-আশ্রম কেন্দ্রিক যা নগর হতে দূরে বিরাজ করতো। ধীরে ধীরে নগরকেন্দ্রিক ছোটো-মাঝারি শিক্ষাকেন্দ্র বা গুরুকুল গড়ে ওঠে পাটলিপুত্র, কাশী ইত্যাদি ছোটোবড়ো প্রায় প্রতিটি নগরে। ধীরে ধীরে ভারতে গড়ে ওঠে সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, যা প্রত্যক্ষভাবে রাজানুগ্রহে পরিচালিত হতো, যেমন তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল দেশের সকল ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলা শিক্ষাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও শিক্ষার্থী আসতো এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকেও আচার্যরা যেতেন ভারতের বাইরে ভারতীয় শিক্ষা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পের প্রসারে। ভারতীয় সমাজ উন্মুক্ত হয়ে নিজেকে মেলে ধরেছিল এবং এশিয়ার প্রায় সর্বত্র ভারতীয় ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এখনও ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, কম্বোডিয়া, চীন, ইরান, ইরাক-সহ বহু দেশে তার চিহ্ন বর্তমান। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে একেক রাজবংশের

প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে নতুন একটি রাজবংশের প্রাধান্যের বিস্তার ঘটতো। পরিবর্তনের পর্যায়ে সাময়িকভাবে সাধারণ নাগরিক জীবনে অস্থিরতা এলেও সামগ্রিক জীবনচর্চার এবং বিজ্ঞান ও শিল্পের ধারাবাহিকতায় বিশেষ ছেদ পড়তো না, বিকাশের গতি অক্ষুণ্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলতো। এর কারণ ছিল অস্তাচলগামী ও উদীয়মান রাজবংশের অভিন্ন বা প্রায় অভিন্ন জীবনবোধ এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা। যতদিন পর্যন্ত দেশীয় রাজন্যবর্গ সামরিকভাবে শক্তিশালী ছিল এবং বহিরাক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল, ভারতীয় সভ্যতার গতি ও বিকাশ ছিল অম্লান। এই বিকাশ রুদ্ধ হয় এবং একসময় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের সামরিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠলে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক R.C. Majumder তাঁর 'Ancient India' পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ের 'Invasions of Sultan Mahmud' শীর্ষক অংশে বলছেন, ...the Ialamic forces had obtained a footing in India as early as the eight century A.D. They, however, failed to make any lasting impression beyond the territory of Sindh. This was mainly due to the Pratiharas, who had stood as a bulwark against the aggression of the Muslims ever since their first raids into India...With the decline of the Pratiharas no power was left strong enough to oppose a successful resistance to the aggressions of Islam...(P. 306)

'no power was left strong enough' অংশটি বলছে সামরিক দুর্বলতার কথা। এর ফল হয় সর্বনাশা, যার এক নিদারুণ বিবরণ আমরা পাই এই ঐতিহাসিকের রচনায়। প্রতিহাররাজ আনন্দপাল এবং অন্যান্য হিন্দু রাজাগণ উপলব্ধি করেন সমাগত ইসলামিক আগ্রাসন এবং দেশের অভ্যন্তরে তার নির্মম পরিণতি। প্রতিহাররাজের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমভারত ও মধ্যভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য একত্রিত হয়ে সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই রাজ্যগুলি ছিল সামরিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু এবং এদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সমুদ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যর মতো কোনো সামরিক দক্ষ ও বিচক্ষণ সেনাপ্রধান ছিল না। প্রাথমিক লড়াইয়ে খানিকটা সাফল্য পেলেও সামরিক বিচক্ষণতার অভাবে হিন্দু নৃপতিগগণের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে সুলতান মামুদের হাতে। এর পরবর্তী ভারতের ইতিহাস ভয়ংকর। R.C. Majumder বলছেন, What followed took the breath of India away. Year after year Mahmud repeated his incursions into India...From first to last his Indian policy was inspired merely by the primitive instincts of plunder, devastation, massacre and desecration. (P. 307-311)

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বরেণ্য ঐতিহাসিক লিখছেন, 'Big cracks had already been made therein and it was no longer a question of whether but when the mighty structure would fall.'

সবশেষ! আঁধার নেমে এল ভারতবর্ষে বিশেষ করে উত্তরপশ্চিম, উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। পরবর্তী প্রায় পাঁচ শতাব্দী ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে সময়ে সময়ে ভেসে বেরিয়েছে হাহাকার। বিগত প্রায় দুই সহস্র বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে সমাজ একটু একটু করে নিজেকে মেলে ধরে এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান- শিল্পকলা-স্থাপত্য-আর্থিক সমৃদ্ধির উচ্চাসনে আসীন হয়েছিল, স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় যে সমাজ দুকূল ছাপিয়ে বয়ে চলছিল উন্মত্ত গতিতে, যার জলোচ্ছ্বাসে ভিজেছিল এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ, সামরিক শক্তির দুর্বলতা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেই সমাজকে করে তুললো বিজাতীয় বৈদেশিক শক্তির পদানত এক পুতিগন্ধময় জলাভূমি। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস হয়ে যায়। অমূল্য গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয়। আচার্য্য এবং শিক্ষার্থীগণ হয় নিহত কিংবা পলাতক। ছিন্নভিন্ন দিশেহারা এক সমাজ। উন্মুক্ত প্রসারিত নব নব বিকাশের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত এক প্রসবিনী সমাজ কালক্রমে হয়ে উঠল অতিরক্ষণশীল বন্ধ্যা।

পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের সময় হিন্দু জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়, কিঞ্চিৎ কাজও হয় কিন্তু পূর্বের গরিমা পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে চর্চায় যে দীর্ঘমেয়াদি সুনিশ্চয়তা আবশ্যক, তা তাঁরা দিতে পারেননি। ৪০০-৭০০ এডি (খ্রিস্টাব্দ)-তে, যে সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিল, ধ্বংস হওয়ার পর সেই সমাজে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকালে অর্থাৎ প্রায় ছয় শতাব্দী পর। সামরিক শক্তির দুর্বলতা হেতু বহিরাক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হওয়ায়, অসংখ্য মানুষের মৃত্যু এবং মন্দির ধ্বংসের ঘটনাই কেবল ঘটেনি, সমাজ সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে গেল প্রায় এক হাজার বছর। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখা এবং বাস্তবে রূপ দেওয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, যিনি সামরিক প্রাজ্ঞতার মাধ্যমে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন এবং একইসঙ্গে বহিঃশত্রু দমন ও অভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা প্রদান করে ভারতীয় ধ্যানধারণা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যবংশীয় প্রধান রাজন্যবর্গ সামরিক শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে রক্ষা করেছিলেন দেশের সীমা ও শান্তি, সহায় হয়েছিলেন সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশের। ভারতের ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় একটি রাষ্ট্রের, একটি জাতির শান্তি ও সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্য কতখানি আবশ্যক এবং সামরিক দুর্বলতা কতখানি মর্মান্তিক।

সম্প্রতি আফগানিস্তানের তালিবানি ক্ষমতা পুনর্দখলের মূলেও বর্তমান আফগান সরকারের সামরিক দুর্বলতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। ফল, ওই দেশের সাধারণ মানুষের মানবিক অধিকারের চূড়ান্ত অবমাননা। সিরিয়ায় দীর্ঘসময় ধরে ঘটে চলা গৃহযুদ্ধের মূলেও রয়েছে সামরিক দুর্বলতা, যা অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক শক্তিকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ। ইদানীংকালে চীন-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন প্রান্তে সময়ে সময়ে চৈনিক সেনার উপস্থিতি ও বাড়বাড়ন্ত দেখা গেলেও কখনই তা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেনি বা করবে না, চীন-ভুটান সীমান্তে ডোকলামে একটানা ৭৩ দিন চৈনিক সেনা ও ভারতীয় সেনার মুখোমুখি অবস্থান (যাকে চীন সরকার আন্তর্জাতিক আঙিনায় 'ভারতের দাদাগিরি' বলেছিল), তা সম্ভব হয়েছিল ভারতের সামরিক ক্ষমতার উৎকর্ষতার সৌজন্যে। একই কথা সত্য ছোট্টো দেশ ইজরায়েলের ক্ষেত্রেও। এই দেশ টিকে রয়েছে এবং নিজের সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে সামরিক ক্ষমতার জোরে, অন্যথায় এই দেশটির কোনো অস্তিত্বই থাকবে না পৃথিবীর মানচিত্রে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে সামরিক ক্ষমতার উপর ভর করে ইহুদি জাতির উত্থান এবং সহস্র বছর পূর্বে সামরিক ক্ষমতার দুর্বলতা হেতু উন্নত সমৃদ্ধ হিন্দু তথা সনাতন সমাজের পতন এটাই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে— অস্ত্র ও যুদ্ধনৈপুণ্য রাষ্ট্রের ও জাতির স্থিতিশীলতা, শান্তি ও বিকাশের ইতিহাসসিদ্ধ অনিবার্য শর্ত। উপযুক্ত সমরাস্ত্র ধারণ এবং ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে পিছপা হলে সেই জাতি বা রাষ্ট্র অবলুপ্তির পথে চলে যায়।

শারদ সংখ্যা

আমার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা' শারদ সংখ্যা পড়ে খুব ভালো লাগল। পুজো সংখ্যা ১৪২৯ প্রকাশিত হয়েছে। স্বস্তিকা শারদ সংখ্যার প্রতিটি লেখাই খুবই মনোগ্রাহী। স্বামী জ্ঞানলোকানন্দের 'শক্তি ও সমন্বয়ের সাধনা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা' পড়ে মুগ্ধ হলাম। তিনি খুব সুন্দর ভাবে বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব শ্রীশ্রীদুর্গাপুজোর কীভাবে সূচনা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঋকবেদ হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম বেদ। শ্রীশ্রী চণ্ডী ও গীতাতেও মহামায়া দেবীর উল্লেখ রয়েছে। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতাতে উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্বয়ং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিজয় কামনায় শ্রীশ্রীদুর্গার স্তব করছেন।

রামায়ণ মহাকাব্যে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র স্বয়ং শ্রীশ্রীদুর্গার পুজো করছেন। শক্তিরূপেণ দেবী দুর্গার স্তরের উল্লেখ আছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। মহালয়ার দিন দেবীদুর্গার আবাহনে যা আমরা শুনি বেতারের মাধ্যমে। মা দুর্গা শক্তিসাধনার সকল শক্তির আধার স্বরূপ। বঙ্গদেশে আমরা মাকে দেবীদুর্গা রূপে পুজো করি।

অন্য অনেকে প্রদেশে মাকে আমরা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি রূপে উপাসনা করে থাকি। তবে হিন্দুদের মধ্যে মা উমা ঘরের মেয়ে রূপে পূজিত হন। বছরের একটি সময়ে মা উমা পিতৃগৃহে আসেন এবং চারটি দিন থাকেন শক্তি ও আনন্দস্বরূপে। তাই এই শারদ উৎসবে আমরা নব আনন্দে মেতে উঠি কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব না নিয়ে সম্পূর্ণ একত্রে।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

শ্রদ্ধা ওয়াকরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড লাভ জিহাদের কুফল

শ্রদ্ধা ওয়াকরের হত্যা নিয়ে তোলপাড় দেশ। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড একজন মানুষ করতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। 'লিভ ইন' শর্তে শ্রদ্ধা ওয়াকরের জীবন ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এর মূলে রয়েছে 'লাভ জেহাদের' তত্ত্ব। সমাজ সচেতন লোকেরা সেই কবে থেকে সতর্ক করে আসছেন ভারতের হিন্দু সমাজকে। কিন্তু হুঁশ হয়েছে কি সমাজের? এই জন্য তথাকথিত আধুনিক, নিজেদের প্রগতিবাদী বলে জাহির করা কিছু মানুষ এই লাভ জেহাদের পক্ষে সওয়াল করলেও বাস্তব পালটে যায়নি। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এই শ্রদ্ধার হত্যা। শ্রদ্ধা এই প্রগতিবাদীদের একজন। এক কল সেন্টারের কর্মী ছিলেন শ্রদ্ধা। আফতাব আমিন পুনাওয়ালার সঙ্গে প্রেম এবং পরিবারের অমতে বাড়ি ছেড়ে লিভ ইনের নামে অজানা লক্ষ্যে জল্লাদের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন এক অন্ধকার গহ্বরে। অন্য ধর্মে বিশেষত মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা লিভইন হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চ বিত্ত মেয়েদের মধ্যে ফ্যাশন ও প্যাশন দুটোই দেখা যাচ্ছে। হিন্দুরা অনেকে এটাকে প্রগতিবাদী মোড়কে পুরলেও বিধর্মীরা নিজেদের সামাজিক লাভ বলে মনে করে। কারণ হিন্দু কন্যা বিবাহ করলে তাদের অন্তত দুজন সংখ্যা বাড়বে। একজন হলো মেয়েটি, অন্যজন হলো অন্য ধর্মের ছেলের ঔরসে জাত মেয়েটির সন্তান। অতীতে দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমের সম্পর্কে আত্মিক বন্ধনটা ছিল বেশি। আধুনিকতার জোয়ারে শারীরিক চাহিদার প্রাধান্য ছাপিয়ে যাচ্ছে আত্মিক সম্পর্ককে। গোলমাল শুরু এখানে। বিয়ের পর বিভিন্ন কারণে ছেলে-মেয়েরা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে অন্য মহিলা ও পুরুষের সঙ্গে। পশ্চিমি দুনিয়ার কুপ্রভাব যেন গ্রাস করছে ভারতীয় সমাজকে। শ্রদ্ধা ও আফতাবের ব্যাপারটা এরকম ছিল। অতীতে দুই তরুণ তরুণীর যোগাযোগের মাধ্যম ছিল পত্র। প্রায় দেখা যেত এই চিঠি চালাচালির বার্তা পৌঁছে যেত অভিভাবকদের কাছে। পাত্র পছন্দ না হলে মায়েরা মেয়েকে বুঝিয়ে অনেক সময়ে অন্য পাত্র দেখে বিয়ে দেবার সুযোগ পেত।

আধুনিক যুগে মুঠো ফোন দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এই লাভ জিহাদকে সহজলভ্য করেছে। আজকের ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকদের পরোয়া না করেই দেশ বিদেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে। অনেক সময়ই প্রতারণার শিকার হতে হচ্ছে। শ্রদ্ধার ব্যাপারটা এরকমই একটি প্রতারণা। এটা এক প্রকার সামাজিক ব্যাধি। কিন্তু এই ব্যবস্থা থেকে আধুনিক প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের কীভাবে বাঁচানো সম্ভব? প্রেমের শুরু কিন্তু বিশ্বাস থেকে। সেটা অবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় পরবর্তী সময়ে। সমস্যা কঠিন, সমাজবিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে এই সমস্যার সমাধানে।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

রাগ অনুরাগের মতো অনুপ্রেরণা অনুদানে আপনাকে বড়ো ভালো লাগে

বর্তমান সরকার কেবল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় টিকে আছে। তাঁর দুটো উপসর্গ সুনামির মতো ভীষণ ভয়ংকর। প্রথম অনু উপসর্গ প্রেরণার আগে বসে তাঁর অনুপ্রেরণা হয়ে মহিষাসুরের মতো ত্রিভুবন জয় করার বাসনায় মত্ত হয়ে উঠে। বর্তমান সরকার বলে কিছু নেই। কেবল তাঁর অনুপ্রেরণায় সব কিছু হয়। খেলা, মেলা, কাটমানি, তোলাবাজি থেকে শুরু করে দুর্নীতি, স্বজন পোষণ সবই তাঁর অনুপ্রেরণায় হয়। চাকরি চোর পার্থ, গোরুচোর কেষ্টর মতো আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-নেত্রীদেরও জন্ম হয় তাঁরই অনুপ্রেরণায়। তাই বর্তমান সরকারের এমএলএ, এমপি থেকে শুরু করে যত মন্ত্রী, এমনকী আমলা এবং সবাই দুর্নীতির শিখরে জড়িয়ে পড়ে কেবল তাঁর অনুপ্রেরণায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে, একটাও

সৎ নেতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দলটা যেন ঠিক ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়ের মতো। এমনিই তাঁর মহিমা অনুপ্রেরণার অবদান।

প্রেরণা এবং অনুপ্রেরণার মধ্যে তফাত কী? প্রেরণা যদি (inspiration) কোনো ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি, উৎসাহ হয় কাউকে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত (motivated) করা হবে অনুপ্রেরণা বা motivation। তৃণমূলে সুপ্রিমো নিজে মহাম্মদ বিন তুঘলকের মতো আবেগ তাড়িত হয়ে তাঁর দলের অন্যদের পৃথিবীর যতো কুকর্ম, দুষ্কর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন। এইভাবে তাঁর দলের প্রায় সবাই জেল খাটতে চলেছেন। এমনি তাঁর অনুপ্রেরণা। তাঁর অনুপ্রেরণার জ্বালা জনগণ এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। এখনো আর একটা উপসর্গ বাকি আছে। এখন সে দানের আগে বসে অনুদান হবে। বহু চর্চিত সেই অনুদানের কথা সবাই জানে। রাগ অনুরাগের মতো অনুপ্রেরণার অনুদানে আপনাকে বড়ো ভালো লাগে কারণ রাজকোষ শূন্য করে ৪৩০০০ পুজো ক্লাবকে ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন এবারে পুজোর জন্যে। অন্য কারোর অনুপ্রেরণায় নয়, তিনি নিজের প্রেরণায় ঘোষণা করেছেন। ২৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে। মেলা খেলা, দান খয়রাতিতে থাকে টাকা। কেবল সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র বেলায় ফাঁকা।

এবার জানব দান আর অনুদানের মধ্যে তফাত কী? দান মানে নিজের পকেট থেকে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কোনো কিছু দেওয়া দান বা গিফট। আর অনুদান বা গ্র্যান্ড হচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা বিলি। তিনি তাঁর পছন্দমতো কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা ক্লাবকে ইচ্ছামতো অনুদান দিতে সিদ্ধহস্ত, কারণ কোটি কোটি টাকা তাঁর পকেট থেকে যাবে না। এ যেন ঠিক লাগে টাকা দেবে গৌরী সেনের মতো। তাই তিনি ক্লাবগুলোকে পুজোর অনুদান হিসেবে অকাতরে ব্যয় করছেন, রাজকোষ শূন্য হলেই বা কী। তাঁর ওই প্রিয় উপসর্গ দুটো অর্থাৎ অনুপ্রেরণা আর অনুদান যদি কখনো হঠাৎ ভ্যানিশ হয়ে যায়, তিনি কি ফিনিকস্ পাখির মতো আবার জন্ম নেবেন? এখন এটাই বঙ্গবাসীর কাছে কোটি টাকার প্রশ্ন।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী বনাম হিন্দুশরণার্থী

মোটামুটি পাক-ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ৭৫ বছর ধরে পূর্ববঙ্গ (তার পরিচয় 'পূর্বপাকিস্তান' বা বাংলাদেশ' যাই হোক) হতে সরকারি নীতি ও সেই দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মুসলমানদের একাংশের দ্বারা হত্যা, নারীধর্ষণ, অপহরণ, ধর্মান্তরকরণ, অগ্নিসংযোগ, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি বহুমুখী অত্যাচারের শিকার হয়ে এবং কোনো বিচার না পেয়ে হিন্দুরা অবিরাম দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব অত্যাচারের প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। পক্ষান্তরে সম্ভবত বছর চারেক ধরে মায়ানমার সেনাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ ও ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। এই সমস্যাগুলির সঙ্গে তিনটি দেশ— মায়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারত জড়িত। কিন্তু মায়ানমার ত্যাগ করে আসা রোহিঙ্গা ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দু শরণার্থীদের দেশত্যাগের কারণ এক নয়। এটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মুসলমানদের মজহব 'ইসলাম'-এর ভিত্তি 'কোরানে' একমাত্র আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ, নামাজ রোজা ইত্যাদি নিরীহ কিছু কথা থাকলেও অপর সকল ধর্মকে অস্বীকার করে একমাত্র 'ইসলাম' আল্লার নিকট গ্রাহ্য, প্রচণ্ড হিংসাত্মক 'জেহাদ' ও পরমত অসহিষ্ণু মানবতা বিরোধী কথা প্রচুর।

যেহেতু মুসলমানরা কোরানকে আল্লার অভ্রান্ত বাণী বলে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, মহম্মদকে আল্লার ঘোষিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসুল এবং তাঁকেই অনুসরণীয় বলে মানে। সুতরাং তাদের একমাত্র লক্ষ্য মনেপ্রাণে মুসলমান বা 'মোমেন' অর্থাৎ 'ইসলাম' বিশ্বাসী হওয়া ও 'কাফের' অর্থাৎ অমুসলমানদের হত্যা করা, যদি না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। কোরান নির্দেশিত এই অমানবিক অন্ধবিশ্বাস বিশ্বকে রক্তাক্ত করছে। মহম্মদ হতে আজ অবধি প্রায় দেড় হাজার বছরের ইসলামের এই আগ্রাসী ইতিহাস তার প্রমাণ।

শুধু পূর্ববঙ্গের হিন্দু নয়, স্মরণাতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে বা বিশ্বের কোথাও হিন্দুরা কোনো কারণেই অপর ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করেনি। তারা চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু রোহিঙ্গারা মুসলমান। মায়ানমারেও তাদের ধর্মীয় চরিত্রানুযায়ী সেখানের অহিংস বৌদ্ধদের উপর নানা অত্যাচার চালাচ্ছিল। সেখানে তাদের ইতিহাস আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ দত্তের 'নিঃশব্দ সন্ত্রাস' পুস্তিকার ২৯নং পৃষ্ঠায় তার বিবরণ আছে। মায়ানমারের সেনাবাহিনী বিনা কারণে তাদের উপর চড়াও হয়নি। অতএব শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তাঁদের জন্মভূমি ত্যাগের সঙ্গে আরব থেকে আগত মায়ানমারে বসতিস্থাপনকারী মুসলমান রোহিঙ্গাদের দেশত্যাগ এক করে বিচার করা যায় না। রোহিঙ্গারা ভালো মানুষ নয়, তা জেনেও মুসলমান বলেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মায়ানমারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন।

—কমলাকান্ত বণিক,
নিবাধুই স্কুলপাড়া, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

With Best Compliments from-

A Well Wisher

শিশুর সঙ্গে তার মতো করে মিশতে হবে মা-বাবাকে

অপরূপা

চার বছরের গোগল এখন বড়ো দুষ্টু। তার দুষ্টুমি দিন দিন বাড়তেই থাকছে। এত দুষ্টুমির জন্য গোগল এখন বাকি বাচ্চাদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। গোগলের মতো বাড়ন্ত বাচ্চাদের সামলানো বাবা-মায়েদের পক্ষে খুব কঠিন। দুষ্টু প্রকৃতির বাচ্চাদের সামলাতে বাবা-মায়েদের আরও একটু বেশি যত্নশীল হতে হবে। বাচ্চার চারপাশে একটা এমন সীমা তৈরি করে নিতে হবে যাতে বাচ্চার রাগ, অপরের প্রতি খারাপ ব্যবহার আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

প্রতিদিনের রুটিন তৈরি করুন : আপনার বাচ্চার বয়স অনুসারে একটা রুটিন তৈরি করে নিন। যদি আপনার বাচ্চা খুব ছোটো হয়, তবে খুব সহজ একটা রুটিন তৈরি করে নিন। যাতে আপনার ছোটো খুদে খুব সহজেই সেই রুটিন মেনে চলতে পারে। যেমন ধরুন, অনেক বাচ্চা কোনও জিনিস দেখলে সেটা কিনে দেওয়ার বায়না করে। কিছু কিছু বাচ্চাকে ভোলালে, তারা সেটা বোঝে। কিছু কিছু বাচ্চা সেটা চাই মানে চাই। তারা এতটাই জেদ করে যে তাদের সামলানো অভিভাবকদের কাছে মুশকিল হয়ে যায়। বাচ্চাকে যদি আপনি একটা নির্দিষ্ট রুটিনের মধ্যে রাখতে পারেন, তাহলে তার জেদ কিছুটা হলেও কমে।

রুটিন মাফিক কাজ না করলে বাচ্চাকে মারধর করবেন না। এতে বাচ্চার মনে হিংসাত্মক মনোভাব জন্ম নেবে এবং আরও বেশি জেদি হয়ে যাবে। কোনও জিনিস ওর মনের মতো না হলে সকলকে অমান্য করবে।

নিজের মতো থাকতে দিন : বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি উদাস হয়ে যায়। তাই যেদিন স্কুল ছুটি থাকবে বা পড়াশোনার চাপ কম থাকবে, সেদিন বাচ্চাকে নিজের মতো করে কিছু করতে দিন। যেমন— বাচ্চা যদি আঁকতে ভালোবাসে, তাহলে তাকে আঁকার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখুন। কিছুক্ষণ অন্য বাচ্চার সঙ্গে খেলতে দিতে পারেন। আপনার ঘরের কোনও কাজে সাহায্য করার মতো অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমেও তাকে ব্যস্ত রাখতে পারেন।

হোমওয়ার্ক দিন : হালকা কোনও কাজ দিন বাচ্চাকে। যেটা করতে ওর মজা লাগবে। প্রতিদিনের রুটিনে এমন কোনও কাজ আপনার শিশুর মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

বাচ্চা বড়ো হচ্ছে সেটা প্রত্যেক অভিভাবকের কাছেই প্রতিনিয়ত একটা চিন্তার বিষয়। বাচ্চাকে নিজস্ব স্বাধীনতা দিন। তবে যেহেতু আপনার বাচ্চা দুষ্টু তাই ওকে একা ছাড়বেন না। বাচ্চাকে চোখে চোখে অবশ্যই রাখুন, তবে কখনো সখনো একটু স্পেস দিন।

ছোটো ছোটো ভুল থেকে কিছু শেখান : ছোটো বাচ্চার কাছে রুটিন বিষয়টা শেখা খুবই মুশকিল। তবে বাচ্চাদের মধ্যে ছোটো থেকেই অভ্যাস তৈরি করুন। যেটা আজীবন ওর সঙ্গী হয়ে থাকবে। যেমন, হোমওয়ার্ক করে রাতে শুতে যাওয়া। এই অভ্যাস যদি একবার আপনি কোনও বাচ্চার মধ্যে তৈরি করতে পারেন, তাহলে খুব সহজে সে নিজের ভুলগুলো বুঝতে শিখবে। অনেক বাচ্চা দুষ্টু স্বভাবের জন্য পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে। এতে স্বভাবতই বাবা-মায়ের চিন্তা অনেকটা বেড়ে যায়। পড়াশোনায় তাঁর মনোযোগ বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত প্রেসার দেবেন না। বাচ্চা যদি রেজাল্ট খারাপ করে তবে বাচ্চাকে দোষ না দিয়ে ওর খামতিটা বোঝার চেষ্টা করুন। বকা দিয়ে কোনও ফলই হবে না।

৬-৮ বছরের বাচ্চার মন বেশি পড়ে থাকে টিভি, মোবাইল গেম, কম্পিউটার, ভিডিয়ো গেমের দিকেই। বারণ করলে তাদের মধ্যে জেদ তৈরি হয়ে যায়। তাই একটা কথা মনে রাখতে হবে টিভি, মোবাইল গেমের মতো এন্টারটেনমেন্ট জিনিস দিয়ে বাচ্চাকে খেলতে দিন, তবে বেশি নয়। বাচ্চাকে বলে দিন, একটা সময়ের পর আর তাকে টিভি বা গেম খেলতে দেওয়া হবে না। ৯-১২ বছরের বাচ্চার রুটিন একটু কড়াভাবে বানান। এই সময় বাচ্চারা যদি কোনও ভুল করে তাকে ছোটোখাটো বকা, কিছুক্ষণ কথা না বলার মতো শাস্তি দিতে পারেন। তবে গায়ে হাত তোলা, ঘরে বন্ধ করে রাখা, সারাদিন ওই বিষয়টা নিয়ে চেঁচামেচি করা ইত্যাদি করবেন না। এতে হিতে বিপরীতও হতে পারে। অনেক বাচ্চাই আছে যাদের সকলের সামনে বকা দিলে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এই ধরনের বাচ্চাদের ধারণা থাকে তারা সকলের সামনে কাঁদলে, পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে সে সহানুভূতি পাবে। কিন্তু এই পরিস্থিতি তৈরি করবেন না। পরিবারের বাকি সদস্যদেরও বুঝতে হবে, সে যে বিষয়টা করেছে সেটা অন্যায়। দুষ্টু প্রকৃতির বাচ্চাদের বেশি বকাবকি করলে কিন্তু আপনার প্রতি তার রাগ জন্মাতে পারে। বাবা-মা হিসেবে নিশ্চয়ই এটা আপনি চান না। তার থেকে বাচ্চাকে বুঝিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করুন। এটা মনে রাখলে ধীরে ধীরে সমস্যার সমাধান হবে। □

বাচ্চার পেটব্যথায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

কান্না শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বিশেষত জন্মের পরে প্রথম তিন মাস। কিন্তু সদ্যোজাত শিশু কোনো কারণ ছাড়াই ঘন ঘন কাঁদলে মা-বাবার জন্য তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই কান্নার কারণ হতে পারে কলিক পেন। 'কলিক বা পেটব্যথা কোনো মারাত্মক অসুখ নয়। সাধারণত কলিক বলতে ইনফ্যান্টাইল কলিককেই বোঝায়। জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতি ১০ জন বাচ্চার মধ্যে একজন কলিকে আক্রান্ত হয়। দিনে তিন ঘণ্টা, সপ্তাহে তিন দিনের বেশি আর তিন সপ্তাহ ধরে যদি কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই একটানা বা একটু পর পর অনেকক্ষণ শিশু কেঁদে যায়, তা থেকে রোগনির্ণয় করা হয়। শিশুর জন্মের ছ'সপ্তাহ থেকে চার মাস পর্যন্ত এটি হতে পারে।'

উপসর্গ কী?

কলিক বা পেটব্যথা হলে বাচ্চা রোজ একই সময়ে কাঁদে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কান্নার সময়টা হয় সন্ধের দিকে বা রাতে। হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠতে দেখা যায়। অনেক সময়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ লাল হয়ে যায়। অনেক বাচ্চাই কাঁদতে কাঁদতে পা পেটের কাছে তুলে নিয়ে আসে। অনেকের হাত মুঠো হয়ে যায়। এই ব্যথার জন্য শিশুর ঘুমেরও অনিয়ম হয়। অনেক সময়েই বমি, ডায়রিয়ার লক্ষণও প্রকট হয়। সঙ্গে তাপমাত্রাও ১০০ ডিগ্রির উপরে উঠতে শুরু করলে বুঝতে হবে কলিকের কারণে এমন হচ্ছে।

প্রায় সব শিশুর কেন কলিক পেন হয়, তার কারণ নিয়ে চিকিৎসকেরা নিশ্চিত নন। শিশুর খাদ্যতন্ত্র বড়োদের মতো পরিণত নয়। আর সে কারণেই দুধ খাওয়ালে তা ঠিকঠাক হজম না হয়ে চলে যায় ক্ষুদ্রান্ত্রে। এ জন্য পেটে গ্যাস তৈরি হয়। এই গ্যাস খাদ্যনালি বেয়ে উঠে আসে উপরের দিকে। গ্যাসের সঙ্গে পাকস্থলীতে হজমে সহায়ক যে অ্যাসিড জমা হয়, তাকেও ঠেলে তুলে আনে। এই দুয়ের ব্যথা সহ্য করতে না পেরেই শিশুটি কেঁদে ওঠে। আবার বোতলে ভর্তি দুধ না থাকলে, দুধের সঙ্গে হাওয়াও চলে যেতে পারে পেটে। তা থেকেও গ্যাস তৈরি হয়। দুধে অ্যালার্জির কারণেও এমনটা হতে পারে। শিশুর খাদ্যতন্ত্র অপরিণত বলে অনেক সময়ে ল্যাকটোজ সহ্য করতে পারে না।

কলিকের ব্যথায় কী করবেন?

ঘরোয়া কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখলেই কলিক থেকে শিশুটি মুক্তি পায়। এক্ষেত্রে শিশুর বাবা-মাকে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। আদর করে ধীরে ধীরে কান্না থামানোর চেষ্টা করতে হবে। শিশু বিরক্ত হয়, এমন কোনো কাজ করা যাবে না। আরও লক্ষ্য রাখতে হবে, বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় ওর মাথাটা যেন একটু উঁচুতে থাকে। খাওয়ানোর পরে বাচ্চার পেটের গ্যাস বার করিয়ে দিতে হবে। তার জন্য বাচ্চাকে কাঁধে শুইয়ে পিঠ মালিশ করে দিন। আবার বাচ্চাকে খাটে শুইয়ে ছোট্টো পা দুটো সাইকেল প্যাডলিঙের মতো একবার ভাঁজ করুন আর সোজা করুন। ঘরে হালকা আলো জ্বালান। ওকে আরাম দিতে স্নানের আগে রোজ বডি অয়েল দিয়ে পেটের অংশে বৃত্তাকারে হাত ঘুরিয়ে সাবধানে মালিশ করুন।

চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন

গ্যাসের ব্যথা কমানোর ওষুধ বা চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সিমথিকোন ড্রপ দেওয়া হয়। কান্নার সঙ্গে বমি, ডায়রিয়া ও জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বাচ্চার অন্য কোনো রোগ না থাকলে এবং ওজন ঠিক থাকলে, এটিকে কলিক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কলিক মারাত্মক অসুখ নয়। বাচ্চার বয়স চার-পাঁচ মাস হলে এ ব্যথা ধীরে ধীরে চলেও যায়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথিতে কারণ, লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ক্রিমি থাকলে 'সিনা ৩০' ভালো কাজ করে। এছাড়া কলোসিন্থ, ম্যাগ-ফস, বোটোনিকা প্রভৃতি ওষুধ ভালো কাজ করে। তবে কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ▯

রাজ্যের ভাঁড়ে মা ভবানী

দীপ্তাস্য যশ

শোনা যায় রবার্ট ব্রুস সাতবার যুদ্ধে হেরে অবশেষে জয়লাভ করেছিলেন। ইতিহাসের এই গল্পটি বহুল চর্চিত। বারেবারেই নানা ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাতে এই গল্পটি বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বোধহয় এরকমই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছে মাননীয়ার দ্বারা। সেই কারণেই বোধহয় বারবার কোর্টে মুখ পুড়িয়েও এখনও রাজ্য সরকার ক্ষান্ত দেয়নি। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে নানা টালবাহানা করতে করতে স্যাট, হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চ, রিভিউ পিটিশন সব জায়গায় ডিএ না দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে এখন সুপ্রিমকোর্টে পৌঁছেছে এবং সম্ভবত একইভাবে মূল মামলা, তারপরে রিভিউ পিটিশন ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে আরও বছর পাঁচেক কাটিয়ে দেওয়াই রাজ্যসরকারের লক্ষ্য। বলাই বাহুল্য, এই দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে যে পরিমাণ অনুপ্রেরণা দরকার, তা সরকারের প্রধান মুখ্যমন্ত্রীই জুগিয়ে চলেছেন, কখনও নরমে, কখনও গরমে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কী পরিমাণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে তার প্রমাণ হলো এবারের ছাব্বিশ ডিসেম্বরের ছুটি। ছাব্বিশ ডিসেম্বরের ছুটিকে হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আরও একটি খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন, তারা আসলে রাজনৈতিক মমতা ব্যানার্জির ছলনার কথাটি মাথায় রাখছেন না। এর আগে বলেছিলেন, 'ঘেউ ঘেউ করবেন না', কে জানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ঠিক কী ভেবে উনি 'ঘেউ ঘেউ' করতে বারণ করেছিলেন, তবে তাঁর সে ধমকে কোনো কাজ হয়নি তা বলাই বাহুল্য। তাই এখন ধরেছেন ছুটির রাস্তা। ছুটি দিয়ে তিনি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ না পাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। তবে এইখানে কিছু মজা আছে। রাজ্য সরকারি কোনো কর্মচারীই যে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পান না তা নয়। যেমন দিল্লিতে বঙ্গ ভবনে যারা কাজ করেন তারা কেন্দ্রীয় হারেই ডিএ পান। রাজ্য সরকারের ব্যাখ্যা যেহেতু দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বেশি, তাই ওখানে ডিএ বেশি। যদিও একটু তথ্য ঘাঁটলেই দেখা যাচ্ছে গত ত্রৈমাসিক দিল্লিতে যেখানে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ৭ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ৯ শতাংশেরও বেশি। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের যুক্তিটি এক্ষেত্রে ধোপে টিকছে না।

বস্তুত একটি বাদে রাজ্য সরকারের কাছে আর কোনো যুক্তিই নেই ডিএ না দেওয়ার, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই সত্যটি স্বীকার করে নিতে পারছে না মুক্তকণ্ঠে। সত্যটি হলো রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে দেউলিয়া করে ফেলেছে। আর যেহেতু এই রাজ্যে সরকারের সমস্ত পদক্ষেপই ভোট রাজনীতির উপরে নির্ভরশীল, ডিএ নিয়ে টালবাহানারও একই কারণ।

হাইকোর্টে এর আগে পুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়া সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকার কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল সব রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাই কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পেয়ে গেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরপরে ডিএ নিয়ে আদালত অবমাননার মামলায় রাজ্য সরকার জানায় যে, সব রাজ্য কর্মচারীকে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হলে রাজ্যে অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থা জারি হবে। প্রশ্ন হলো, যে রাজ্যে কয়েক লক্ষ কর্মীকে তাদের প্রাপ্য মেটাতে

গেলে দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়, সেই রাজ্য সরকারের কি এমন বাধ্যবাধকতা এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও ক্লাবগুলিকে পুজো উপলক্ষ্যে অনুদান দেওয়ার? এই ক্লাবগুলির মধ্যে বেশ কিছু আবার এমন ক্লাব যাদের পুজো বাজেট কয়েক কোটি টাকা। স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে, এইভাবে তেলা মাথায় তেল ঢেলে রাজ্যের কী লাভ হচ্ছে?

এক কথায় এর উত্তর একটাই। এইসব অনুদানে রাজ্যের অর্থনীতির কিছু লাভ নেই, লাভ আছে রাজনীতির। বস্তুত এই অনুদানের মাধ্যমে শাসক দলের প্রচেষ্টা নিজস্ব দলীয় ক্যাডার তৈরি করা। তাই নিজ কর্মচারীদের প্রাপ্য অপেক্ষা তাদের কাছে রাজনৈতিক স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সর্বত্র এই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সর্বক্ষেত্রে দেউলিয়া অবস্থার সম্মুখীন। সেই অবস্থাকে ঢাকা দিতেই এখন নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে রাজ্য সরকার।

যেমন হাইকোর্টে ডিএ মামলায় সর্বক্ষেত্রে পরাজিত হওয়ার পরে রাজ্য সরকার এখন ডিএ না দেওয়ার আবেদন জানিয়ে দ্বারস্থ হয়েছে সুপ্রিমকোর্টের। সেখানে প্রথমেই একটি ইচ্ছাকৃত ত্রুটিপূর্ণ আবেদন করা হলো যাতে সেই ভাবে খানিক সময় নষ্ট করা যায়। তারপরে যেই ডিএ সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট জানালো যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে এখনও এই মামলায় কোনো স্থায়ী কেস নাম্বার নির্দিষ্ট হয়নি, তাই হাইকোর্ট আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করে শুনানি করবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ত্রুটিপূর্ণ আবেদন সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আবেদন জানানো হলো। সব দেখেশুনে মনে একটিই কথা আসে, 'আর কতোই রঙ্গ দেখাবি মা'। এবার এই নানারকম ছলচাতুরীর খরচা পড়েছে নাকি প্রায় দশ কোটি টাকার কাছাকাছি। সত্য মিথ্যা রাজ্য সরকারই জানাতে পারে, কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের মতে হিসেবটা এরকমই। ভাবুন, যে সরকার নিজে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাচ্ছে যে ডিএ দিতে হলে তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে, তারাই পুজোয় অনুদান দিচ্ছে প্রায় তিনশো কোটি, আর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছে আরও প্রায় কয়েক কোটি। কী অসাধারণ নমুনা 'সুশাসন' এবং 'মজুবত' অর্থনীতির।

আসলে এই রাজ্য সরকার, শাসকদল যেমন একদিকে রাজ্যের অর্থনীতি, পরিবেশ, সংস্কৃতিকে নষ্ট করেছে গত এগারো বছরে, তেমনই নষ্ট করেছে রাজ্যের কর্ম সংস্কৃতির। ছুটির এতো পার্থক্য বোধহয় আর কোনো রাজ্যেই নেই। এতোদিন তাও দিন দেখে একটা কিছু কারণ দেখিয়ে ছুটি দেওয়া হতো। এখন তো কোনো কারণ ছাড়াই এমনি এমনিই ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একবার খালি ভাবুন, যারা ছুটি দিয়ে নিজের কর্মচারীদের খুশি রাখতে চায়, কাল যদি কোনো কর্মচারী কোনো আর্থিক তছরূপ করেন, অর্থের জন্য সাধারণ মানুষকে হয়রান করেন, তাহলে কি এই রাজ্য সরকার সেই কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে? বিপুল দুর্নীতির বহর দেখে তো তেমন প্রত্যয় মনে জাগে না, বরং নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে তারা এসবে উৎসাহই দেবে। ফলে রাজ্যে দুর্নীতি বাড়বে, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে এবং এসবের সরাসরি প্রভাব পড়বে আমাদের সমাজব্যবস্থায়, অর্থনীতিতে। নষ্ট হবে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ। এই কারণেই ডিএ মামলা শুধুমাত্র রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া উচিত। ডিএ বাড়লে শুধু সরকারি কর্মীদের উপকার হয় তাই নয়, ওই টাকা অর্থনীতিতে ঢোকে, অন্য ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরও উপকার হয়।

— সুকান্ত মজুমদার
রাজ্য সভাপতি, বিজেপি

ডিএ : পশ্চিমবঙ্গে কত

কেরল	৩৬ %
তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ	৩৪ %
উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র	৩১ %
ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ড	২৮ %
কর্ণাটক	২৭ %
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৮ %
হরিয়ানা ও পঞ্জাব	২৮ %
অসম	৩১ %
ওড়িশা	৩৪ %
হিমাচল প্রদেশ	৩১ %
গোয়া ও উত্তরাখণ্ড	৩৪ %
রাজস্থান	৩৪ %
গুজরাট ও বিহার	২৮ %
পশ্চিমবঙ্গ	৩ %

ভবিষ্যতের প্রশ্ন নয়, তা আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়েও নানাবিধ প্রশ্ন তুলছে।

প্রতিটি সরকারকেই বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিতে হয় সমাজের হিতার্থে। কিন্তু সেই কর্মসূচিগুলি নেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে প্রয়োজনীয়তার দিকটি। যেমন আবাস যোজনা, মিড ডে মিল, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত এগুলি প্রয়োজনীয়। এই প্রকল্পগুলি সমাজের প্রান্তিক অংশের উন্নয়নে সাহায্য করে। কিন্তু পুজোয় অনুদান সমাজের কোনো উপকারেই লাগে না। কাজেই রাজ্য সরকার নিজেই যখন স্বীকার করে নিচ্ছে রাজ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে অকারণ দানছত্রের থেকে সমাজের হিতকারী প্রকল্পগুলিতেই অধিক মনোযোগ জরুরি এবং এই প্রকল্পগুলিকে সফল করতে রাজ্যে উন্নত কর্মসংস্কৃতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনাও জরুরি। তাই ডিএ নিয়ে অকারণ টালবাহানা না করে রাজ্য সরকার তার রাজনৈতিক স্বার্থে চালু হওয়া অনুদান প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করে কর্মীদের প্রাপ্য মেটাক। আর যদি রাজ্য সরকার এই প্রাপ্য মেটাতে একান্তই অপারগ হয় সেক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করুক রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি সংশোধন করার জন্য এবং রাজ্য তথা দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্যের সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থাকে অধিগ্রহণ করে রাজ্যের সহায়তা করার জন্য। অকারণ টালবাহানা না করে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সরকারি কর্মীরা চাইলে প্রশাসনের চাকা আটকে দিতে পারেন

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এবার ভাগ করার চক্রান্ত শুরু করল রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার। একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে রাজ্য সরকারের তরফে একটি প্রচেষ্টা চলছে আমরা-ওরা তত্ত্বের প্রয়োগের। এখানে জানা যাচ্ছে যে এবার রাজ্য সরকারের তরফে শুধুমাত্র সরাসরি সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেবার ব্যাপারটি নিয়েই আদালতের কাছে নথি জমা পড়েছে। তাতে নেই স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে সরকার পোষিত সব ক্ষেত্রের কর্মচারীরা। যেখানে সংখ্যাটি কম নয়। মাত্র তিন লক্ষের কিছু বেশি কর্মচারী এই ডিএ পাবার ব্যাপারে সুবিধা পাবেন। উপেক্ষিত থেকে যাবেন সিংহভাগ কর্মচারী। বাদের তালিকায় রয়েছেন অনেকেই, শিক্ষকের সংখ্যাই যেখানে চার লক্ষের ওপর, এর ওপর

রয়েছেন পুরসভা থেকে পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা। একটি সূত্র বলছে এই বিষয়ে মাস্টার প্ল্যান রেডি।

এদিকে রাজ্য সরকার নানা বাহানায় কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা না দেবার রাস্তায় হাঁটছেন। এই সরকারের শাসন ব্যবস্থার শুরুতেই সরকারের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে মহার্ঘ্যভাতা সরকারি কর্মচারীদের কোনো অধিকার নয়। সরকারের দয়ার দান। সেই কথাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার রাস্তায় চলেছে এই সরকার। যখনই কর্মচারীরা মহার্ঘ্য ভাতা চেয়েছেন, তখনই সেই চাওয়াকে সারমেয় বা মার্জারের ডাক বলে কটাক্ষ করেছেন মহামহিম সরকার। দীর্ঘদিন সেই কটাক্ষ সহ্য করে আদালতের কাছে যেতে বাধ্য হয় রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। আদালত মহার্ঘ্যভাতাকে কর্মচারীদের অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ মহার্ঘ্যভাতা এ পর্যন্ত দিয়েছে, সেটাই দেওয়ার জন্য কর্মচারীদের পক্ষে রায় দেয়। এবং তা তিন মাসের মধ্যে মিটিয়ে দেবার নির্দেশও দেয়। এরপর বেপরোয়া ভাব আসে রাজ্য সরকারের তরফে। তারা রাজ্যের উচ্চ আদালতের গণ্ডি পেরিয়ে চলে যায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। আর সেখানে মহার্ঘ্য ভাতা নিয়ে সময় নেবার খেলার মেতে ওঠে। শুধুমাত্র এই কেসটি দাখিল করার জন্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা খরচ ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে সরকার। এরপর কেসটি চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চলেছে সরকার।

অন্যদিকে সমস্ত সরকারি কর্মীকে বঞ্চিত করার জন্য একেবারে অন্য একটি বাহানা জনমানসে প্রচার করে চলেছে। সেটি হলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লক্ষ কোটি টাকা পাওনার একটি মনগড়া কাহিনি। অথচ তারা একবারের জন্যও বলছে না যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন

খাতে আসা কেন্দ্রীয় টাকার ইউটিলাইজেসন সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়, সেটা তারা দীর্ঘদিন দিচ্ছেন না। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাওয়া টাকা খরচ করার কোনো হিসেব তারা দিচ্ছেন না। নিয়ম অনুযায়ী এই হিসেব দেবার পরই দেওয়া হয় পরের কিস্তির টাকা। সেই নিয়মে যদি ব্যাঘ্যাত ঘটে, তার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। টাকা আসা বন্ধ। একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে আনা দরকার। রাজ্যের স্কুলগুলিতে যে গ্রান্ট আসে, সেই গ্রান্টের টাকা খরচার হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে 'ইউটিসি' দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়। এই বুঝিয়ে দেবার পরে সেটি বেশ কয়েকটি ধাপে অডিট হয়। তবেই পরের গ্রান্ট আসে। আর যদি দেখা যায় যে কোনো টাকা খরচ হয়নি, সেই মর্মে সরকারকে জানাতে হয়। সেরকম হলে চেক মারফত ফেরতও দিতে হয় অব্যবহৃত টাকা। এই ব্যবস্থা সরকার পরিচালিত সব বিভাগেই আছে। প্রশ্ন হলো, সরকার যখন সেই নিয়মে চলে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হিসেব দিতে বাধা কোথায়? তাহলে কি ধরে নিতে হবে ঘোটালা আছে বলেই হিসেব দিতে পারছেন না।

এই পাওনার কথা শুনিয়ে আমাদের রাজ্য সরকার কতকটা মুর্খের মতো কাজ করছে। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন ও মহার্ঘ্য ভাতার বিষয়টি রাজ্য বাজেটেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। আর সেই মতো টাকা বাজেটে ধরা হয়েও থাকে। ফলে রাজ্য সরকার যে কর্মচারীদের এই টাকা না পাওয়ার সঙ্গে ডিএ দেবার বিষয়টিকে গুলিয়ে দিতে চাইছে, সেটাও একটা চাল।

এখন রাজ্য সরকারি কর্মীরা মাত্র তিন শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা পান। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা পান ৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ ফারাক প্রায় ৩৫ শতাংশের। আর এখান থেকেই উঠেছে বঞ্চনার বিষয়টি। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তরফে বারে বারে বলা হচ্ছে যে এক পয়সাও বাকি নেই এই মহার্ঘ্য ভাতার। সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাবার পর রাজ্য সরকারি কর্মীরা, পেনশন প্রাপকরা রাস্তায় নেমেছিলেন বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে

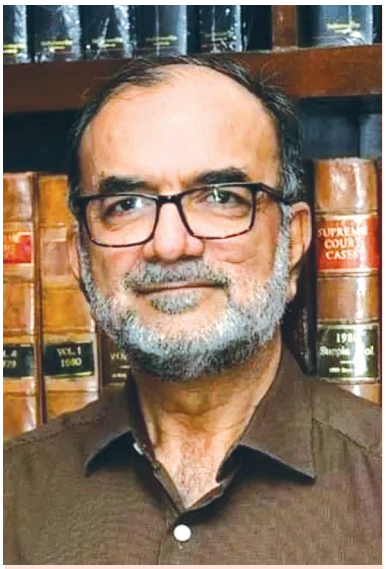

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা অভাবনীয়। পুলিশ ধৃতদের ছেড়ে দেবে বলেছিল, কিন্তু তার পরেও ছাড়েনি। আন্দোলনকারীরা কি বোমা ছুঁড়ছে, নাকি অন্য কিছু করেছে? কলকাতায় ১৪৪ ধারা হামেশাই ভাঙে। কী দোষ এদের? হেফাজতে রাখার কী যুক্তি? ডিএ দেবে না, আন্দোলনও করতে দেবে না?

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য,
আইনজীবী।

দেবার দাবি জানাতে, এসপ্ল্যানেড থেকে রাজ্য বিধান সভার উদ্দেশে তারা যাচ্ছিলেন। তাঁদের জুটেছে লাঠির আঘাত। ফেটেছে মাথা। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৪২ জন। তাঁর মধ্যে আদালতের কর্মীও আছেন। এহেন আন্দোলনের ক্ষেত্রে দমনপীড়ন নীতি কী কারণে? সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

২০১৬ সালের নেওয়া পঞ্চম বেতন কমিশন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ১২৫ শতাংশ হারে ডিএ পেতেন। তখন রাজ্য সরকারের কর্মীরা পেতেন ৭৫ শতাংশ ডিএ। সেই সময় ফারাক ছিল ৫০

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ-র গ্যাপ ৩৫ শতাংশ। ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের হকের পাওনা। স্যাট থেকে শুরু করে সিঙ্গল বেঞ্চে ডিএ-র বৈধতা স্বীকৃতি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলা তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টে অত্যন্ত সিনিয়র ল'ইয়ার অ্যাপয়েন্ট করেছি। তাঁরা পুরো বিষয়টা দায়িত্ব নিয়ে দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের সরকারি কর্মচারী, রিটায়ার্ড কর্মচারী, শিক্ষক এবং পঞ্চায়েত, পুরসভা-সহ রাজ্য সরকারের স্থায়ী অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের এই লড়াইয়ে বিজেপি তাঁদের পাশে আছে। ২০২৫ সাল থেকে পুরো বকেয়া যাতে এককালীন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা পান তাঁর জন্য যা করণীয় তাই করা হবে।

শুভেন্দু অধিকার, বিরোধী দলনেতা, বিজেপি।

শতাংশ। পরে রাজ্য সরকার আরও ১৬ শতাংশ ডিএ বাড়িয়ে দেয়। এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্মীদের ডিএ-র ফারাক দাঁড়িয়েছে ৩৫ শতাংশে। একবার দেখে নেওয়া যাক অন্য রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা কী হারে মহার্ঘ্যভাতা পেয়ে থাকেন। মহারাষ্ট্রে ৩৪ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৩৪ শতাংশ, কর্ণাটক ৩১ শতাংশ, রাজস্থান ৩৮ শতাংশ, ওড়িশা ৩৪ শতাংশ, পঞ্জাব ৩৪ শতাংশ, গুজরাট ৩১ শতাংশ, ঝাড়খণ্ড ৩৪ শতাংশ, বিহার ৩৪ শতাংশ। আমাদের রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা পেয়ে থাকেন শুধুমাত্র ৩ শতাংশ। কেন তাদের এই বঞ্চনা?

রাজ্য সরকার বারে বারে বলছে তাঁদের দেবার সদিচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন দেওয়ার মতো অর্থ তাঁদের কোষাগারে নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে নানা খাত যেমন উৎসব, মেলা, খেলা প্রভৃতিতে কোটি কোটি টাকা রাজ্যের কোষাগার থেকে খরচ হচ্ছে। এমনকী এই ডিএ মামলা চালাতেও খরচ হচ্ছে রাজ্যের কোষাগার থেকে। ভাবতে অবাক লাগে দেশ কেন পৃথিবীতে এমন নজির মনে হয় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ঘটছে, যেখানে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে আদালতে লড়ছে রাজ্য সরকার। আর কোষাগার থেকেই ব্যয় করা হচ্ছে সেই আইনি লড়াইয়ের টাকা, যে টাকা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানা উপায়ে আদায় করা টাকা। অন্যদিকে খরচ করার টাকার কথা ছেড়ে দিলেও প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে, ২০১১ সালে রাজ্যের বিধায়করা যে বেতন পেতেন, আর আজ যা বেতন পান তা গত ১১ বছরে কয়েকশত গুণ বেড়েছে। এখন একজন বিধায়ক পান ৮১ হাজার টাকার মতো বেতন, আর মন্ত্রী হলে ১,১১,৯০০ টাকা। যার মধ্যে যে ডিএ তারা পান, সেটা একজন সাধারণ সরকারি কর্মী কল্পনাও করতে পারেন না। কেউ পান মাসে ৬০ হাজার, তো কেউ ৯০ হাজার। আর রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেলায় শূন্য।

মহার্ঘ্যভাতা নির্ধারিত হয় প্রাইস ইনডেক্সের ওপর ভিত্তি করে। গত কয়েক বছরে (২০১৬ সালের পর) এর গ্রাফ যে হারে বেড়েছে, তা সংবাদপত্র মারফত সবাই জানেন। তাই বিশদে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গত ২০০৯ সালের বা ২০১৯ সালের রোপা অনুযায়ী মহার্ঘ্যভাতা সেই হারে বাড়েনি। ফলে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা যে ভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন সেটা ভারতের আর কোনো রাজ্যে হচ্ছে না।

আমাদের রাজ্য সরকার মিথ্যের ওপর ভর করেই গিমিকের হাত ধরে রাজ্য শাসনের পথ পেরিয়ে চলেছে। এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার ছাড়া কোথাও যেতে পারেন না। এমনকী যুবরাজও তাই। এই ভাবে সরকারি পয়সার অপব্যবহার নিয়েও সরব সাধারণ মানুষ।

সব শেষে বলা দরকার, রাজ্যের দশ লক্ষের বেশি সরকারি কর্মচারী। তাঁদের পরিবারবর্গ সমেত পরিধিটাও কম নয়। মুখ্যমন্ত্রী যদি ভাবেন যে কী করবে রাজ্যের সরকারি কর্মীরা? তাহলে ভুল ভাববেন। মুখ্যমন্ত্রীর জিয়ন কাঠি ও মরণ কাঠি রয়েছে তাঁদের হাতেই। তাঁরা ইচ্ছে করলেই স্তব্ধ করে দিতে পারবেন গোটা প্রশাসন। তাদের ভালো বলতে হয় কারণ তারা এত বঞ্চনা, অবজ্ঞার পরেও মুখ বুঝে প্রশাসনের গাড়ির চাকা গড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। এবার কিন্তু তাঁরা (শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের অনেকেই কিন্তু আছেন এই লড়াইয়ে) আস্তে আস্তে লড়াইয়ের ময়দানে নামছেন। ফলে সাবধান। মুখ্যমন্ত্রীর শাসনের লাগাম কিন্তু আলগা হয়ে গেছে অনেকটাই। ■

সেবাগাথা ওয়েবসাইট বাংলা সংস্করণের উদ্বোধন

গত ২৭ নভেম্বর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডস্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটির সভাগৃহে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট 'সেবাগাথা'র বাংলা সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ রাজকুমার মটালে। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ডিরেক্টর, আইআইটি খড়্গপুর, অধ্যাপক ভি কে তেওয়ারী। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন পদ্মশ্রী ডাঃ জগদীশ চন্দ্র হালদার এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডাইরেক্টর দেবমিতা মিত্র। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে। তিনি বলেন, সেবাগাথা কেবলমাত্র একটি ওয়েবসাইট নয়, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দ্বারা সেবাযাত্রার বিবরণ প্রেরণাস্বরূপ জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর এক অভিযান। সেবার কথা প্রচার করা নয় বরং সেবা প্রচারের মাধ্যম। সঙ্ঘের সেবা বিভাগের ওয়েসাইট সেবাগাথা সমাজের মধ্যে সেবার বার্তা ছড়িয়ে দেবার ডিজিটাল মাধ্যম, যেখানে সারা দেশে চলা সেবাকাজের ছবি, ভিডিয়ো, পোস্টার, অডিয়োর মাধ্যমে প্রেরণাদায়ী ঘটনা প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, কু-এর মতো ৪৮টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজ চলছে। হিন্দি, ইংরেজি, মারাঠি,তেলুগু, মালায়ালাম, কন্নড় ও গুজরাটি এই সাতটি ভাষায় পাওয়া যায়, আজ থেকে বাংলাভাষায়ও পাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

সেবাগাথার পরিচয়াত্মক বক্তব্য রাখেন ওয়েবসাইটের অখিল ভারতীয় সম্পাদিকা তথা সংযোজিকা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিংহ। সেবাগাথা ওয়েবসাইটটি প্রযুক্তিগতভাবে কতটা সক্ষম এবং এতে আরও কী কী আকর্ষণীয় ফিচার্স রয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা করেন ওয়েবসাইটের প্রযুক্তি বিভাগের প্রমুখ স্বপ্নিল পারখিয়া। সেবাগাথা টোলির পরিচয় করান প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ। পরে একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে সেবাগাথার কাজের প্রদর্শন করা হয়। প্রধান বক্তার ভাষণে অখিল ভারতীয় সহ সেবাপ্রমুখ রাজকুমার মটালে সঙ্ঘের সেবা বিভাগের কাজের বিবরণ এবং ওয়েবসাইট তৈরির কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সারা দেশে রাষ্ট্রীয় ভাবনা জাগরণের কাজ করে চলেছে। পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং জনজাতিদের মধ্যে সমরসতার ভাব জাগ্রত করার কাজ করে চলেছে। অধ্যাপক তেওয়ারি সমসাময়িক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেবার মাধ্যমে মানসিক স্থিতি পরিবর্তনের কথা বলেন। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেন ভারতবর্ষ সবসময়ই সেবাভাব যুক্ত আর সেই ভাবেরই পুনর্জাগরণের কাজ করে চলেছে সেবাগাথা। ডাঃ হালদার সঙ্ঘের সেবাকাজের প্রশংসা করে বলেন সঙ্ঘের সেবাকাজে তিনি পূর্ণরূপে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছেন। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন সুমনা ঘোষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রান্ত সহ সেবাপ্রমুখ প্রকাশ মণ্ডল।

সারদা বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীর জাতীয় স্তরের ক্রীড়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার

শুধু লেখাপড়ার গণ্ডিতে আটকে না থেকে সার্বিক দিক থেকে উন্নতি ঘটাতে উৎসাহ প্রদান করে চলেছে রায়গঞ্জ শহরের সি.বি.এস.ই অনুমোদিত সারদা বিদ্যামন্দির। ক্ষেত্রীয় স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হওয়া ৬ জন শিক্ষার্থী গত ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যামন্দিরের দশমশ্রেণীর ছাত্রী মানসী সিং অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগের সটপুট (১০.০৪ মিটার) প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার হিসেবে সোনার মেডেল এবং ডিসকাস থ্রোয়িঙে (২৬.৪৬) দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে রুপোর মেডেল লাভ করে। প্রতিযোগীরা রায়গঞ্জে ফিরে আসার পর বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। এর ফলে প্রতিযোগীরা খুবই খুশি হয়। মানসীর কৃতিত্বের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বিদ্যামন্দিরের প্রধান আচার্য রাজবলী পাল অত্যন্ত খুশি হয়ে শিক্ষার্থীদের যেমন উৎসাহ প্রদান করেন, তেমনই আগামীদিনে আরও বেশি সাফল্য অর্জনের জন্য শারীরিক বিভাগের প্রমুখ তপন দাস এবং একই বিভাগের আচার্যা শ্রীমতী সুমনা মাহাতো-সহ ওই বিভাগের সমস্ত আচার্য-আচার্যার ওপর দায়িত্ব প্রদান করেন।

শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন

শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে হাওড়া জন শিক্ষণ সংস্থান, নবাসন, হাওড়ার সহযোগিতায় গত ২৬ নভেম্বর তাজপুরের প্রসাদতীর্থ সভাগৃহের জনাকীর্ণ সভায় ভারতীয় সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নবীন বেতারশিল্পী কৌস্তুভ রায়। শুরুতেই জনশিক্ষণ সংস্থানের পরিচালক নরোত্তম রায় সংবিধানের মুখবন্ধ উপস্থিত সবাইকে শপথ হিসেবে পাঠ করান। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন নরোত্তম রায়, মলয় অধিকারী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পৃথ্বীশ কুমার সামন্ত ও শিক্ষক নন্দলাল মণ্ডল।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

লাচিত বরফুকনের তলোয়ারের সামনে নতজানু হয়েছিল মুঘল শাসক

রণিতা চন্দ

বিশ্বের সর্ব প্রাচীন সভ্যতা ভারতবর্ষের ওপর বহুবার আঘাত হেনেছে বিদেশি আক্রমণকারীরা— তা তারা মধ্য প্রাচ্যের মরু দস্যুই হোক অথবা ইউরোপীয় উপনিবেশকারী। তাদের উদ্দেশ্য শুধু ভারতের অগাধ ধনসম্পদ লুট করাই ছিল না, তারা চেয়েছিল ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে ধুয়েমুছে দিয়ে, দেশের মানুষকে নৈতিকভাবে দেউলিয়া বানিয়ে দিতে। কোনো রাষ্ট্র যদি তার বীরদের বীরত্বের গাথা পরবর্তী প্রজন্মকে শোনাতে অক্ষম হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্র যতই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা হোক, সেখানে দুঃসাহসী বীর আর জন্মগ্রহণ করেন না। তাই আমাদের দেশের বিদেশি শাসকরা, যাদের মধ্যে সর্বশেষ ঔপনিবেশিক শাসক ছিল ইংরেজরা, এদেশেরই কিছু বিশ্বাসঘাতক বামপন্থী ঐতিহাসিকের সাহায্যে ভারতমাতার বেশকিছু বীর সন্তানের বীরগাথা দেশের পরবর্তী প্রজন্মের পাঠ্যসূচি থেকে বাদ রেখেছিল।

এমনই এক অকীর্তিত দেশভক্ত হিন্দু বীর ছিলেন অহোম সাম্রাজ্যের লাচিত বরফুকন। ৪০০ বছর আগে অহোম সাম্রাজ্যের সেনাপতি লাচিত প্রবল পরাক্রমশালী ও অতীব নৃশংস মুঘল সেনাকে ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে শরাইঘাটের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। লাচিত উপাখ্যান যদি সমগ্র ভারতবাসীকে শোনানো যেত তাহলে তারা এ বিষয়ে অবগত হতো যে মুঘলরা আদৌ অজেয় নয়। কিছু স্বার্থান্বেষী ইতিহাসবিদ ভারতীয়দের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করার জন্য সে সমস্ত হিন্দু বীরের বীরত্বের গাথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছতে দেয়নি, যারা কিনা মুঘল তথা অন্যান্য ইসলামি ও ইউরোপীয় শাসকদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। লাচিত বরফুকন তাঁদের মধ্যে একজন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসী বীর সেনাপতি।

লাচিতের জন্ম হয় ২৪ নভেম্বর, ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে, বর্তমান অসমের চারদেওতে। তিনি ছিলেন মোমাই তামুলী বরবরুয়ার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। মোমাই তামুলী তার জীবন শুরু করেন চুক্তিভুক্ত শ্রমিক হিসেবে। তারপর নিজের শক্তি, বীরত্ব ও দৃঢ়তাকে সম্বল করে তার উত্থান ঘটে এবং তৎকালীন অহোমরাজ প্রতাপ সিংহ তাকে তার মন্ত্রীসভায় নিযুক্ত করেন এবং তিনি বরবরুয়া উপাধি গ্রহণ করেন।

ভারতের উত্তরপূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত অহোম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য প্রখ্যাত এই অহোম সাম্রাজ্য বারবার ভিনদেশি আক্রমণকারীদের কুনজরে পড়ে। দিল্লির মসনদে আসীন তুর্কি ও আফগান বংশোদ্ভূত শাসকরা এবং পরবর্তীতে মুঘল শাসকরা অহোমের উপর আক্রমণ হানে বহুবার।

অহোম সাম্রাজ্যের উপর মুঘল হানা আরম্ভ হয় ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে। অহোম-মুঘল সংঘর্ষের উত্তপ্ত সময়কালে লাচিতের বেড়ে ওঠা। খুব অল্পবয়স থেকেই লাচিত সামরিক কৌশল ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। লাচিত তাঁর তীব্রতা ও যুদ্ধে দক্ষতার ফলে খুব শীঘ্রই অহোমরাজের মন জয় করে নেন এবং রাজার আপ্ত সহায়ক নিযুক্ত হন। এছাড়াও তাঁকে রাজ আস্তাবল ও প্রাসাদরক্ষীদের অধীক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে কর্মরত তৎকালীন বাঙ্গলার সুবেদার মির

জুমলা-২ অহোম রাজ্য আক্রমণ করে এবং অহোমের রাজধানী গড়গাঁ দখল করে। অহোমরাজ, জয়ধ্বজ সিংহ তখন পালিয়ে গিয়ে নামরূপে আশ্রয় নেন। অহোম সেনা যদিও মির জুমলার সেনাকে গড়গাঁ ও মধুপুরেই সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয় কিন্তু অহোম সেনাপতি বাদুলি ফুকানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অহোম সেনা মুঘল সেনার কাছে হার স্বীকার করে এবং ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঘিলাঝাড়িঘাট চুক্তি নামক একটি আপত্তিজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই ঘৃণ্য চুক্তিতে মহারাজ জয়ধ্বজের কন্যাকে সম্রাটের হারেমের বাঁদি করা হয়। ২০ হাজার তোলা সোনা, ৩ হাজার তোলা রুপো, ১২ মাসের মধ্যে ৯০টি হাতি পাঠানোর মতো অতিশয় ন্যক্কারজনক কয়েকটি শর্ত রাখা ছিল। নিজেরই সেনাপ্রধানের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন মহারাজ জয়ধ্বজ মাথা নত করে এই চুক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মহারাজ জয়ধ্বজের কোনো পুত্র না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর অহোমের সিংহাসনে বসলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই চক্রধ্বজ সিংহ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, প্রবল দেশপ্রেমিক ও পরাক্রমী চক্রধ্বজ মুঘলদের কাছে অহোমের এই অপমানজনক হার মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি শপথ নেন যে অহোমকে তিনি মুঘলদের হাত থেকে মুক্ত করবেন। লাচিত বরফুকনকে তিনি অহোম সেনার প্রধান নিযুক্ত করেন এবং মুঘল সেনাকে পরাস্ত করার ভার দেন। মহারাজ চক্রধ্বজ মুঘলদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে লাচিতকে একটি সোনার তলোয়ার উপহার দেন।

সুবিশাল ও শক্তিশালী মুঘল সেনাকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে লাচিত অহোমের সমগ্র বীর ও যুদ্ধে পারদর্শীদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন এবং ১৬৬৭-এর গ্রীষ্মকালের প্রাক্কালেই সেনার প্রশিক্ষণও সেরে ফেললেন। এবার যুদ্ধের ময়দানে নামার পালা। লাচিতের সক্ষম নেতৃত্বে অহোম সেনা অতি সহজেই মুঘল সেনাদের পরাজিত করে গড়গাঁ পুনরুদ্ধার করলো।

অহোম সেনার কাছে মুঘলদের হারের খবর সম্রাট আওরঙ্গজেবের কানে পৌঁছতেই তিনি ঢাকা থেকে রাম সিংহের তত্ত্বাবধানে একটি বিশাল মুঘল সেনা অহোমের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দেন। লাচিত বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিশাল মুঘল সেনার সামনে তার অহোম সেনা সংখ্যাগত ও প্রযুক্তিগত ভাবে অক্ষম। তাই সম্মুখ সমর থেকে বিরত হয়ে তিনি গেরিলা যুদ্ধে মুঘলদের ঘিরে ফেললেন। তাঁর তীক্ষ্ণ পারদর্শিতা ও দূরদৃষ্টির সামনে মুঘলরা ধ্বস্ত হলো— গেরিলা যুদ্ধে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে অতীব কঠিন হয়ে উঠলো।

এই সময় মুঘল সেনাপ্রধান রাম সিংহের সামনে অহোম সেনাকে পরাজিত করার জন্য একটাই পথ খোলা ছিল— তা ছিল কৌশল। রাম সিংহ তাই ওই কৌশলের পথই বেছে নিলেন। তিনি তার লেখা একটি পত্র একটি তিরের ফলায় বিদ্ধ করে অহোম সেনার শিবিরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। পত্রে লেখা ছিল যে লাচিতকে গড়গাঁ পরিত্যাগ করার জন্য ১ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করা হয়েছে। রাম সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন তার ও জয়ের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাচিত বরফুকন। কাজেই লাচিতকে যেনতেন প্রকারেণ সরাতে পারলে অহম সেনাকে সহজেই পরাস্ত করা যাবে এবং ওই পত্রটি চক্রধ্বজ সিংহের মনে লাচিতকে নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক করবে। মহারাজ হয়তো লাচিতকে বরখাস্ত করে দেবেন। হলোও তাই। ক্রুদ্ধ মহারাজ চক্রধ্বজ লাচিতকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেন। সেই সময় অহোম রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আতন বরগোহাইন মহারাজ চক্রধ্বজকে বোঝালেন যে ওই পত্রটি মুঘলদের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়, যাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে হয়ে লাচিতকে বরখাস্ত করেন এবং মুঘলরা সহজেই যুদ্ধ জিতে যায়। কাজেই মুঘলদের এই কৌশলটিও অসফল হলো। সমস্ত রণকৌশলেই অসফল হওয়ার পর রাম সিংহ নৌযুদ্ধে তৎপর হলেন এবং ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি ক্ষুদ্র নৌ-সেনা সহযোগে ব্রহ্মপুত্র নদের উদ্দেশে অভিযান শুরু করলেন। কিন্তু তার সম্মুখে বিশাল এক প্রতিবন্ধক হিসেবে শরাইঘাটে অধিষ্ঠিত ছিল লাচিত বরফুকনের নেতৃত্বাধীন অহোম নৌ-বহর। শুরু হলো নৌ-যুদ্ধ।

কিন্তু স্থলযুদ্ধেরই মতো জলেও লাচিত দেখলেন যে মুঘল সেনা সংখ্যায় এবং যুদ্ধের আড়ম্বরে অহোম সেনার চেয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে। এমত অবস্থায় অহোম সেনার সামনে যুদ্ধ জয়ের জন্য একটিই সূত্র ছিল— তা হলো দেশপ্রেম ও ইচ্ছাশক্তি এবং তাদের সামনে লাচিত ছিলেন এই দুটোরই জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ। কয়েকজন যুদ্ধ ক্লান্ত ও অনিচ্ছুক সেনাকে পিছুপা হতে দেখে লাচিত একাই একটি নৌকোতে উঠে মুঘল সেনাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। এতে তাঁর সেনাবাহিনীর কয়েকজন তাকে পিছিয়ে আসতে ও বিশ্রাম নিতে উপদেশ দেয়। লাচিত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের কয়েকজনকে জলে ফেলে দেন এবং বলেন, 'আমার রাজা ও রাজ্যের প্রতি আমার যা কর্তব্য তা করতে গিয়ে যদি আমার প্রাণও যায় তাহলেও আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত হবো না। এর জন্য আমি একা যুদ্ধ করতেও রাজি আছি।' তার এইরূপ জয়ের সংকল্প ও দৃঢ়তা দেখে তার সেনাবাহিনী যারপরনাই উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং পুনরায় মুঘল সেনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

নতুন ভাবে উজ্জীবিত অহোম সেনা মরিয়া হয়ে মুঘল সেনার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং

শেষে জয়ের মুখ দেখল লাচিত বরফুকনের অহোম সেনা। এই যুদ্ধটি শরাইঘাটের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। মুঘল সেনা বাধ্য হলো গড়গাঁ ছেড়ে পলায়ন করতে। তারা অহোম রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে মানস নদের তীরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে বাধ্য হলো। কিন্তু সর্বশেষে এক বড়ো মনের পরিচয় দিয়ে লাচিত তার

সেনাকে নিষেধ করেন পলায়নরত মুঘল সেনাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে। এতে লাচিত বরফুকনের বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানবিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

লাচিত বরফুকন তাঁর দেশভক্তির আরেক অসাধারণ উদাহরণ সম্মুখে রেখে গেছেন। শরাইঘাটের যুদ্ধ চলাকালীন তিনি তাঁর মামাকে দায়িত্ব দেন এক মাটির তৈরি দুর্গ গড়তে যা তাঁর যুদ্ধ কৌশলকে সফল করার জন্য সূর্যাস্তের আগেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লাচিত দেখলেন যে ওই দুর্গ তৈরি করা সম্ভব নয়, উপরন্তু তাঁর সেনাবাহিনীর করুণ চেহারা ও তাদের শরীরের ভাষায় আত্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষণীয় ছিল। ক্রুদ্ধ লাচিত নিমেষের মধ্যে তাঁর তরবারি বের করে তাঁর মামাকে হত্যা করলেন। লাচিতের কাছে আত্মীয়তা ও সম্পর্কের চেয়ে অনেক বড়ো ছিল তাঁর দেশ। তাই কাজের গাফিলতি ও সেনাদের মনোবল ভাঙার অপরাধে লাচিত নিজের মামার প্রাণ নাশ করতেও দ্বিধা করেননি। লাচিতের এই অভূতপূর্ব দেশভক্তির নিদর্শন দেখে অহোম সেনা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আবার নতুন উদ্যোমের সঙ্গে মুঘল সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে লাচিত বরফুকনের মতো এক একনিষ্ঠ দেশভক্ত ও বীরের কীর্তিকে সমগ্র দেশবাসী এযাবৎ জানতেও পারেনি। ছোটোবেলার ওই কমিক বই না থাকলে আজ যে ক'জন তাঁর নাম শুনেছেন, তারাও তা শুনতেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের দেশের বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকার উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের দেশের লুপ্ত ইতিহাস, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে দেশবাসীর থেকে আড়াল করা হয়েছিল, তা দেশবাসীর সমক্ষে নিয়ে আসার, তাদের এ বিষয়ে অবগত করানোর, যাতে এ দেশের মানুষ বুঝতে পারে যে এ দেশের উপর যারা আক্রমণ করেছিল তাদের চেয়ে আমাদের পূর্বসূরিরা বীরত্বের নিরিখে একাংশও কম নয়। অহোম সাম্রাজ্যের বীর লাচিত বরফুকনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে দেশের মানুষকে অবগত করানোটাও এই উদ্যোগেরই একটি অংশ। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রতি বছর ২৪ নভেম্বর লাচিত দিবস পালন করা হচ্ছে। এ বছর বীর লাচিতের ৪০০তম জন্মবার্ষিকী সারা দেশে সাড়ম্বরে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। কিন্তু তার আগে, লাচিতের বীরগাথা দেশের প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি মানুষকে অবগত করানো আশু প্রয়োজন।

(লাচিত বরফুকনের ৪০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভারতের যে ইতিহাসের নায়ক এক অহোম সেনাধ্যক্ষ

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

১৯৮২ সালে আমি ক্লাস সেভেনে পড়তাম। মনে আছে, সেইসময় ইতিহাসে লাচিত বরফুকনের কথা পড়েছিলাম। যতবার ওই বিশেষ চ্যাপ্টারটা পড়তাম ততবারই একটু একটু করে লাচিতের বীরত্ব, সাহস আর নায়কোচিত চরিত্র স্পষ্ট হয় উঠত। বড়ো হবার পর যখন উঁচু ক্লাসের ইতিহাস বই হাতে পেলাম, একটা খুব বড়ো পার্থক্য নজরে পড়ল। মুঘলদের কীর্তিকাহিনি ফলাও করে লেখা হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে মুঘল আগ্রাসন যিনি প্রায় একার হাতে রুখে দিয়েছিলেন সেই লাচিত বরফুকনকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

সেই সময়ের ইতিহাস বই পড়লে কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়বে। অসমের ইতিহাস শুরুই করা হতো মাত্র ২০০ বছর আগে থেকে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের একটা ধারণা দেওয়া হতো যে অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নতি শুরু হয়েছিল ব্রিটিশরা ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পর। যেসব লেখক এই ইতিহাস লিখতেন তারা এমন এক ইকোসিস্টেম বানিয়ে নিয়েছিলেন যা সবসময় ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের মানুষ ও সংস্কৃতিকে অনেক দূরের জিনিস বলে চিহ্নিত করত।

যাইহোক, এখন আমরা, আত্মনির্ভর ভারতের নাগরিকেরা লাচিত বরফুকনের ৪০০তম জন্মবার্ষিকী পালন করছি এবং এর ফলে লাচিতের বীরগাথা অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। লাচিত বরফুকনকে অহোম সেনাবাহিনীর কম্যান্ডার-ইন-চিফ নিযুক্ত করেছিলেন রাজা চক্রধ্বজ সিংহ (১৬৬৩-৬৯)। সেই সময় মুঘল বাহিনী অহোম সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়েছিল। রাজা চক্রধ্বজ সিংহ রাজ্যের হারানো অংশ পুনরুদ্ধারের সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবং সেই

কারণেই আওরঙ্গজেবের পাঠানো সাম্মানিক উত্তরীয় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

১৬৬৫ সালে, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এক আলোচনায় রাজা চক্রধ্বজ সিংহ বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনও বিদেশি শক্তির অধীনস্থ হয়ে থাকতে চাই না। একজন স্বর্গগত রাজার উত্তরসূরি হয়ে আমি কীভাবে বিদেশি শক্তির সামনে মাথানত করতে পারি!'

কিছুদিন আগেই মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে অহোম সেনাবাহিনী যখন মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ঠিক সেই সময়ে লাচিত বরফুকন অসম থেকে মুঘলদের তাড়ানোর দায়িত্ব নিলেন। তিনি প্রায় জাদুবলে সেনাদের মনোবল ফিরিয়ে আনলেন এবং মুঘলদের নতজানু হতে বাধ্য করলেন।

লাচিতের শ্রেষ্ঠ চার কীর্তির মধ্যে অবশ্যই থাকবে ১৬৭১ সালের শরাইঘাটের যুদ্ধ। রসদ কম, লোকবল বিশেষ কিছু না, বাহিনীতে যথার্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনারও অভাব— এই অবস্থায় রাম সিংহের নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেন লাচিত। তাঁর ছিল ঋষির প্রজ্ঞা এবং জন্মভূমিকে বিদেশি শাসনমুক্ত রাখার জন্য করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে সংকল্প। যুদ্ধে লাচিতের সব থেকে বড়ো সিদ্ধান্ত ছিল যুদ্ধের সময় ও স্থান নিজের ইচ্ছেমতো বদলানো। তিনি আওরঙ্গজেবের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী সেনাকে সমতল থেকে নদীর ধারে আসতে বাধ্য করেছিলেন। অহোম সাম্রাজ্যের ধারেকাছে সমুদ্র না থাকলেও লাচিত এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন মুঘলরা নৌযুদ্ধে তেমন দক্ষ নয়।

তিনি গুয়াহাটির দিখালিপুখুরিকে নৌবন্দর হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। উদ্দেশ্য, ব্রহ্মপুত্রের জোয়ারের টান থেকে যুদ্ধজাহাজগুলি রক্ষা করা। এই একটা সামান্য ঘটনা মুঘলদের শরাইঘাটে টেনে আনে। শরাইঘাটে ব্রহ্মপুত্র চওড়ায় সব থেকে ছোটো।

এইসব কারণেই লাচিত বরফুকন একজন জাতীয় নায়ক। শরাইঘাটের যুদ্ধ মধ্যযুগের আর পাঁচটা সাধারণ যুদ্ধের মতো ছিল না। এই যুদ্ধে জয়ী হবার ফলে অসম-সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলে মুঘলরা ঢুকতে পারেনি।

(লেখক অসমের মুখ্যমন্ত্রী)

মুক্তামণির তৈরি জুতো পরে পথ হাঁটছে অর্ধেক বিশ্ব

অর্ধেক বিশ্ব

বিশেষ প্রতিনিধি॥ ঘরে নিদারুণ অভাব। স্বামী ও চার সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হতো মুক্তামণিকে। তার ওপর অসুখবিসুখ, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা এবং আরও অনেক খরচাপাতি। মাগ্‌গিগন্ডার বাজারে একজনের উপার্জনে সংসার টানা মুশকিল। তাই ছাপোষা সংসারের হাল ফেরাতে স্বামীর সঙ্গেই চাষের কাজ করতে মাঠে যেতেন মুক্তামণি। তা সত্ত্বেও ঘোচেনি দুর্দশা। মণিপুরের সেই মুক্তামণিই গত বছর সম্মানিত হলেন পদ্মশ্রী সম্মানে। শিল্পনৈপুণ্য, প্রতিভা আর আত্মবিশ্বাস থাকলে জীবনে এগিয়ে চলার পথে দারিদ্র্য যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না তা প্রমাণ করেছেন তিনি। ক্রুশকাঁটা দিয়ে উলের বাহারি জুতো তৈরি করে সামান্য রোজগেরে গৃহবধূ থেকে আজ একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন মুক্তামণি। মণিপুরের এই 'আয়রন লেডি'-র উত্তরণের কাহিনি এখন লোকের মুখে মুখে।

মুক্তামণির জন্ম ১৯৫৮ সালে। তিনি মণিপুরের কাকচিং মৈরঙ্গথেমের বাসিন্দা। জন্মের পরই পিতৃহারা হন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই সহপাঠী ক্ষেত্রময়ুম নারাং সিংহের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। চার সন্তানের মা মুক্তামণি। বড়ো পরিবারের খাওয়া-খরচ জোগাড় করতে স্বামীর সঙ্গে ফসলের খেতে সারাদিন কাজ করতেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে খাবার তৈরি করে তা বিক্রি করতেন। বাড়তি আয়ের জন্য রাতে উল দিয়ে বুনতেন ব্যাগ ও হেয়ার ব্যান্ড।

১৯৮৯ সালের একদিন মেয়ের স্কুলের জুতো কেনার টাকা জোগাড় করতে না পেরে উল দিয়ে বুনে জুতো তৈরি করে দিয়েছিলেন। মেয়ে ভেবেছিল এই জুতো পরে গেলে তাঁকে হয়তো তিরস্কৃত হতে হবে। কিন্তু না। এমন উলের বোনা জুতো দেখে স্কুলের শিক্ষিকারা মুক্তামণির প্রতিভার প্রশংসা করেছিলেন। এক শিক্ষিকা তো কয়েক জোড়া জুতো তৈরির বরাত দিয়ে বসলেন মুক্তাকে। সেই শুরু। ক্রমে তাঁর হাতের কাজের কথা লোকমুখে ছড়াতে লাগলো। একদিন সীমান্ত অঞ্চলে বহাল সেনারা

মুক্তামণিকে জুতো তৈরির অর্ডার দিয়ে গেল নিজেদের পরিবারের জন্য। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি মুক্তামণিকে। পরের বছর ১৯৯০ সালেই তিনি তৈরি করে ফেললেন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'মুক্তা নিটেড সু'। শুরু হলো উদ্যোগপতি হিসেবে তাঁর নতুন পথ চলা। আজ তিনি ভারতের নাম করা উদ্যোগপতিদের মধ্যে একজন। ঝুলি ভরে উঠেছে অগুনতি পুরস্কারে।

চামড়ার জুতোর বিকল্পরূপে তাঁর এই অভিনব উদ্যোগ ধীরে ধীরে সাড়া ফেলতে শুরু করে। মণিপুর রাজ্য সরকার থৌবলের জেলা শিল্পকেন্দ্রের অধীনে উল ও বুনন সূচিকর্ম বিভাগের আওতায় নিয়ে আসে মুক্তামণির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিকে। সরকারিভাবে শুরু হয় 'মুক্তা নিটেড সু'-এর প্রচার। মণিপুরের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী হৌখুমং হাওকিপ তাঁর কাজের প্রশংসা করেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে মুক্তামণির হাতে তৈরি জুতোর বিক্রি বাড়তে থাকলো। আজ তাঁর কোম্পানির তৈরি উলের বোনা অভিনব জুতো ও স্যান্ডেল অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো ও আফ্রিকার দেশগুলোয় রপ্তানি হয়।

মুক্তামণি নিজেই নিজের ভাগ্য বদলেছেন। মাঠে কাজ করা এক অতি সাধারণ এই গৃহবধূ আজ দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের অন্যতম। প্রায় ১০০০ পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''অতীতের দিনগুলি এখনও আমরা ভুলিনি। আমি ও আমার পরিবার সেইসব দিনের কথা মনে করে আরও দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করার উৎসাহ পাই। আমরা কিছুটা ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি। আর বাকিটা বুদ্ধি ও দুহাতের পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের অর্জন করতে হয়েছে। আমি কখনো হাল ছাড়িনি। আমার পথে হেঁটে গেছি''।

এতবড়ো একটা প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্ত্রী হয়েও কিন্তু বসে থাকেন না মুক্তামণি। গড়ে তুলেছেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের স্বনির্ভর করতে নিরন্তর ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাঁর এই নিরলস কর্মসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ একের পর এক পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন তিনি। গত বছর ভারত সরকার তাঁর জীবন সংগ্রামকে অসংখ্য নারীর কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করেছে। মুক্তামণির কথায়, 'ভাবিনি, আমার জীবনে কোনওদিন এতবড়ো সম্মান পাবো। এই সম্মান শুধু আমার নয়, সেই নারীদের যাঁরা পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন'। ▯

‘ভারতেই গড়ে উঠেছিল বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা’

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টরিক্যাল রিসার্চের চেয়ারপার্সন রঘুবেন্দ্র তানোয়ার সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাখিগড়িতে পাওয়া প্রাচান ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, ভারতেই গড়ে উঠেছিল বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা। সেই সঙ্গে তিনি আইসিএইচআর-এর নতুন উদ্যোগ ‘ভারত ঃ লোকতন্ত্র কি জননী’ সম্বন্ধের অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন। স্বস্তিকায় সাক্ষাৎকারটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। স্ব.স.

□ রাখিগড়িতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকেই সম্ভবত ‘ভারত ঃ লোকতন্ত্র কি জননী’— এই ধারণাটি তৈরি হয়েছে। যদি একটু বিশদে ব্যাখ্যা করেন।

● পরিণত হরপ্পা সভ্যতার যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাখিগড়ির গুরুত্ব। এইসব নিদর্শন পরিণত হরপ্পা সভ্যতার সময় আরও ১৫০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এখন পরিণত হরপ্পা সভ্যতার সময় আমরা ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ধরি কিন্তু রাখিগড়ি দেখিয়ে দিয়েছে ৪,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই হরপ্পা সভ্যতা পরিণত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। হরপ্পা সভ্যতাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। ঐতিহাসিক গবেষণায় একজন গবেষককে অনেককিছু অনুমান করতে হয়। ইজিপ্ট ও গ্রিসের মতো রাখিগড়িতে বিশাল-বিশাল সমাধি পাওয়া যায়নি। অথচ প্রত্যেক সমাজে এমন কেউ কেউ থাকবেন যাদের গুরুত্ব অন্যদের থেকে বেশি। কিন্তু রাখিগড়িতে আমরা দেখছি সেখানে কারোর মৃত্যুই অন্যদের থেকে বেশি বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি রাখিগড়ির সভ্যতা ছিল পুরোপুরি সাম্যবাদী।

আমরা যখন ‘গণতন্ত্রের জননী’— এই বিষয়ে কথা বলছি, তখন একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে। রোম ও গ্রিসের সভ্যতা ছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর ঘটনা। কিন্তু এখানে আমরা কথা বলছি ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। পার্থক্যটা এখানে। আমরা যদি সময় সরণী ধরে পিছিয়ে ঋক্‌বেদের যুগে চলে যাই তাহলে সেখানেও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সন্ধান পাব।

□ আইসিএইচআর-এর এই নতুন গ্রন্থে ৪৫টি কেন্দ্রীয় ও ৪৫টি ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩০ জন লেখকের ৯০টি বক্তৃতা (রাখিগড়ি বিষয়ক) সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মূল আইডিয়াটি কী?

● গ্রন্থের এই ভল্যুমে আমরা হরপ্পান, ঋক্‌বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় ৩০টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেছি। এই গ্রন্থে শুধুমাত্র পাথরে খোদাই করা ছবি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণ, পাথরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার এবং মন্দির সম্পর্কিত নানা তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মন্দির কীভাবে তৈরি করা হতো? মন্দির নির্মাণে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুরসরণ করা হতো তার চেহারাটি কীরকম? বিখ্যাত গবেষকেরা এই বিষয়ে লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবতগীতায় গণতন্ত্রের যেসব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তার কথা এখানে বলা যেতে পারে।

□ কিন্তু এই উদ্যোগ এখনই কেন?

● ভারতের ইতিহাসে অসংখ্য মানুষের পা পড়েছে। প্রচুর বিদেশি দখলদার এদেশে হানা দিয়েছে। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ছাপ রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে মিলেমিশে গেছে। যে প্রেক্ষাপট থেকেই তারা আসুক, মোটামুটি একশো বছরের ব্যবধানে তারা সবাই ভারতীয় হয়ে গেছে।

তবে ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে এরকমটা হয়নি। ব্রিটিশ শাসনে তারা আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে ধ্বংস করেছিল। কিংবা বলা ভালো ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। ভারতের সংস্কৃতি, অধ্যাত্ম বা রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব— আমরা যা নিয়ে গর্ব করি, ব্রিটিশ চেয়েছিল এই সবকিছুর ঐতিহাসিক উৎস থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে। আমাদের সভ্যতা অতি প্রাচীন সভ্যতা। ব্রিটেনের সভ্যতার থেকে কয়েক হাজার বছরের পুরনো। ব্রিটিশরা পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভারতকে বোঝার চেষ্টা করেছিল। এখনও ব্রিটেনের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গেলে দেখতে পাবেন গবেষকেরা ভারত নিয়ে নানা বিষয়ে মন্তব্য করছেন। প্রাচীন ভারতের সঠিক ইতিহাস আমাদের লিখতে হবে, যা এতদিন লেখা হয়নি।

লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আমাদের ইতিহাস বইয়ে দেখানো হয়েছে। অথচ ঘটনা হলো, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সকলেই সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবোধের কথা বলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু বা শেষের দিকে জাতীয়তাবোধের যে উন্মেষ ঘটেছিল, কোথায় ছিল তার উৎস? বালগঙ্গাধর তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ কোথা থেকে পেয়েছিলেন প্রেরণা? এখানে আমরা অসম বা হরিয়ানার কথা বলছি না। হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশ এক অখণ্ড জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। দেশকে জেনেছিল মা বলে। এসব কথা যদি অন্য কেউ লিখতে না চান, তার মানে এই নয় যে আমরাও লিখব না। যদি কেউ ইতিহাসের খণ্ডিত অংশেই মনোনিবেশ করতে চান সেটা তার সমস্যা।

□ তার মানে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করার জন্য এটা আপনাদের একটা অ্যাজেন্ডা—

● ১৯৭৭ সালে আমি যেসব পাঠ্যবই পড়েছিলাম, পরের পাঁচ/ছয় বছরে সেসব একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। এখন আর কেউ আর.সি. মজুমদার, যদুনাথ সরকার, রঘুবীর সিংহের বই পড়ে না। এখন নতুন ইতিহাস লেখকেরা এসে গেছেন, তাই না? ঐতিহাসিকদের সমালোচনা বা প্রশংসা কোনওটাই করতে চাই না। আমরা ইতিহাসের ফাঁকফোকরগুলো পূরণ করতে চাই। আমরা মনে করি আমাদের অতীত গৌরবকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই আমরা তাতে আরও বেশি করে মনোনিবেশ করতে চাই। যেসব নিবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তা পুরোপুরি গবেষণামূলক। এইসব নিবন্ধে কোনওভাবেই কোনও ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত করা হয়নি।

আমি আইপিএস পরীক্ষায় বসি, তখন আমায় দক্ষিণ ও পূর্বের রাজ্যগুলির ইতিহাস পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এখন দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাতে দক্ষিণ ও পূর্বের কোনও উল্লেখ পাওয়া যাবে না। এমনি করেই ইতিহাসকে ভাগ করা হয় আর স্কুলের বাচ্চারা সেই ইতিহাস পড়ে বড়ো হয়। ধীরে ধীরে সব বদলে যায়। অথচ আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না। যাইহোক, আমরা মনে করি ভারতই গণতন্ত্রের জননী। আর এই উপলব্ধি সারা বিশ্বকে জানানো আমাদের দায়িত্ব।

আইসিএইচআর যখন কোনও গ্রন্থপ্রকাশ করে তখন তাকে সময় ও গুণমানের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হয়। নয়তো দশজন বলবেন ওরা যখন করেছে তখন নিশ্চয়ই অ্যাজেন্ডা। যদিও আমাদের কোনও অ্যাজেন্ডা নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এইসব লোকেদের নিয়ে আমরা কেন চিন্তাভাবনা করব? তারাই-বা কেন আমাদের সম্পর্কে শেষ কথা বলবে? সভ্যতার বিবর্তনে তারা এসেছেই তো আমাদের থেকে কয়েক হাজার বছর পর। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতি কোনও রাজনৈতিক যুদ্ধের কারণে তৈরি হয়নি। কিন্তু ইউরোপের মানচিত্র দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে এটি রাজনৈতিক মানচিত্র। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশই হয় যুদ্ধ নয়তো কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক সমঝোতার ফলে সৃষ্ট। □

অস্বস্তি নিয়ে শুরু হলো বিশ্বকাপ

নিলয় সামন্ত

প্রথমবারের জন্য বর্ষশেষে আয়োজিত বিশ্বকাপ। আর বত্রিশ দলের শেষ বিশ্বকাপ। পয়সার জোরে উদ্বোধনে চমক ছিল। কিন্তু আয়োজক দেশ এই প্রথম বিশ্বকাপের মূল পর্বে হেরে গেল। খেলল একেবারে সাধারণ মানের খেলা। মাত্র তিন মিনিটের মাথাতেই তারা পিছিয়ে যেত। কিন্তু অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে দেখা গেল ইকুইডরের খেলোয়াড় গোলের আগে অফসাইডে ছিল। তবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল কাতার যদি কোনও ম্যাচ জেতে তাহলে সেটা হবে অঘটন। অর্থাৎ আয়োজক না হলে তাদের বিশ্বকাপ খেলার কোনও যোগ্যতাই নেই।

নেটফ্লিক্সে একটা ডকুফিল্ম দেখাচ্ছে। নাম ফিফা আনকভারড। চার এপিসোডের ওই ফিল্মে সাফ বলে দেওয়া আছে, কাতার কী করে বিশ্বকাপ ফুটবল সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছিল। অনেক অসুবিধে ছিল। ইউরোপের ফুটবল কর্তারা অনেকেই চাননি। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন ফিফার প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটার। আফ্রিকা, এশিয়া আর কনকাকাফ দেশগুলির ভোট জোগাড় করে। সেই ভোট না কি আদায় করতে হয়েছিল ঘুষের বিনিময়ে। ফিফা কর্তাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হন তখন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি এফবিআই।

এতদিন পর সেপ ব্লাটারের চৈতন্য উদয় হয়েছে, কাজটা তিনি ঠিক করেননি। কাতার খুব ছোট্টো দেশ। বিশ্বকাপের মতো এত বড়ো একটা টুর্নামেন্ট ঠিকঠাক করতে পারবে কিনা এমন সংশয় অনেকের মনে দেখা দিয়েছে। কাতার দেশটার জনসংখ্যা মাত্র চৌত্রিশ লক্ষ। যা হোটেল ছিল তাতে তিরিশ হাজারের বেশি ট্যুরিস্টকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। এ দিকে বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখতে আসছেন প্রায় বারো লক্ষ লোক। কোথায় থাকবেন তাঁরা? সংগঠকরা বলছেন বটে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু দোহার মতো ছোটো একটা শহর অত লোকের বোঝা টানতে পারবে তো? সন্দেহ আছে।

অন্য বিশ্বকাপে ছয় সাতটা শহরে ছড়িয়ে খেলা হয়েছে। দোহার আশপাশে আটটা স্টেডিয়াম, খুব কাছাকাছি। কাতার কর্তারা দর্শক নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তো? যে দেশের সেনার সংখ্যা মাত্র বারো হাজার, পুলিশ আরও কম, তাঁরা হুলিগানদের আটকাবেন কী করে? অগত্যা বিদেশ থেকে সাতান্ন হাজার নিরাপত্তা কর্মী ভাড়া করে আনছে কাতার। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, এমনকী পাকিস্তান থেকেও পুলিশ আনা হয়েছে পাহারা দিতে। মুশকিল হচ্ছে, কিছু দর্শক আছেন এমন উগ্র যে তাঁদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। কয়েকটা দেশ এবার কাতারে যাবে, যাদের সমর্থকদের খুব বদনাম আছে। যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইরান, আমেরিকা। দোহার মাঠে এর দলগুলির সমর্থকেরা এখনও

তেমন কিছু ঘটায়নি।

এদের মধ্যে রয়েছে হুলিগানদের হিংস্রতা। হার-জিত শত্রুতার পর্যায়ে চলে যায়। ফ্রান্সের তিন শহরে আর্জেন্টিনা আর ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে পরে খণ্ডযুদ্ধের সাক্ষী ছিলেন কলকাতার সাংবাদিক। তাঁর মুখে শোনা, কবে ফকল্যান্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে দু' দেশের মধ্যে, এখনও তার রেশ কাটেনি। তিন স্টেডিয়ামের বাইরে একটা পার্ক। তার দুপাশে সকাল থেকে জড়ো হয়েছেন ইংরেজ আর আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। মাঝে পুলিশ। দু' দলের মধ্যে স্লোগান পালটা স্লোগান চলছে। বিয়ার বোতল ছোঁড়াছুড়িও। আঁচ পড়েছিল ম্যাচটাতেও। মারামারি করে লাল কার্ড দেখলেন ডেভিড বেকহ্যাম। দশজনে খেলে ম্যাচ হেরে গেল ইংল্যান্ড। গ্যালারিতেও সংঘর্ষ দেখে ভয় পাচ্ছিলাম প্যারিসে ফিরতে পারব কি না। ফরাসি পুলিশ আমাদের সে রাতে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। রাস্তায় আহতদের কাতরানোর দৃশ্য এখনও ভুলতে পারিনি। ইতালি বিশ্বকাপে জার্মানি হল্যান্ড ম্যাচ, পরেরবার ইরান আমেরিকা খেলায় মারপিট দেখেছি। ইংরেজ সমর্থকরা মারাত্মক মাথা গরম। ডাচরাও কম যান না। কাতারে এঁদের ম্যাচে গণ্ডগোল হলে কি কাতার পুলিশ সামলাতে পারবে?

বিশ্বকাপ সুষ্ঠু ভাবে করার জন্য কাতারিরা অবশ্য প্রচুর খরচ করেছেন। স্টেডিয়ামে যাতে প্লেয়ারদের গরম না লাগে তার জন্য এসি মেশিন রয়েছে। প্রায় চার গুণ বেশি বাজেট। তেল বিক্রির টাকা, ওঁরা পারেন বিলিয়ে দিতে। আমার ভয় অন্য জায়গায়। লাতিন আমেরিকার দলগুলোর প্রচুর বায়নাক্কা। সেটা মেটাতে পারবেন তো কাতারিরা? তাছাড়া অবৈধ বেটিঙের স্বর্গভূমি হচ্ছে আরব দেশগুলি। ভয় হচ্ছে বিশ্বকাপ কলুষিত হবে না তো?

৩৪ লক্ষ অধিবাসীর কাতারে নিজেদের আদিবাসী মাত্র ৪ লক্ষ। ভারতীয় ও বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ গিজ গিজ করছেন। কিন্তু পুরো দেশ জুড়েই নারীর সংখ্যা এতটাই কম যে চমকে উঠতে হয়। সাত লক্ষেরও কম। কাতার রক্ষণশীল দেশ হলেও, তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুতের জন্য কাতারের মানুষের মাথাপিছু আয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মাথাপিছু আয় প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার ডলার। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লুক্সেমবার্গের থেকে যা প্রায় ২০ হাজার ডলার বেশি। কিন্তু তবুও বিশ্বকাপ আয়োজনকে কেন্দ্র করে যে হারে অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কর্মযজ্ঞ চলেছে, তাতেই বিক্ষোভের মাত্রাটা বেড়েছে মারাত্মক হারে। যা থামাতে ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফানতিনোকে পর্যন্ত বিবৃতি দিতে হচ্ছে। আর হবে নাই বা কেন? কিছুদিন আগেই ইংল্যান্ডের কোচ গ্যারেথ গেট জানিয়েছেন, ফিফা সভাপতি থামতে বললেই তাঁরা থেমে থাকতে পারেন না। যেখানে মানবাধিকারের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে তাঁরা প্রশ্ন তুলবেনই।

যে গরমের কথা ভেবে প্রথা ভেবে পুরো বিশ্বকাপটাকে নিয়ে আসা হয়েছে শীতকালে, তাতেও তো সমস্যা মিটছে না। ওয়েলস দল ঠিক করেছিল, প্র্যাকটিস করবে দুপুর দেড়টায়। দেখা গেল, তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস! অথচ ওয়েলসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাই হচ্ছে ১২ ডিগ্রি। অতএব প্র্যাকটিস সিডিউলটাই বাতিল করে দিলেন ওয়েলস কোচ।

কিন্তু শেষ বেলায় 'বিয়ার' বিক্রি নিয়ে ফিফার সঙ্গে বিশ্বকাপের সংগঠক কাতারের যে সমস্যা তৈরি হলো, তাতে জল কোনদিকে গড়াবে কেউ বলতে পারছেন না। নির্দিষ্ট লাইসেন্স থাকা একটি মাত্র দোকান থেকেই পারমিট থাকলে পানীয় কিনে আপনি রুমে ফিরে পান করতে পারবেন। কাতারের এই নিয়ম ভাঙলেই শাস্তি। কিন্তু বিশ্বকাপ আয়োজনের অনুমতি পাওয়ার সময় কাতারের সঙ্গে ফিফার যা চুক্তি হয়েছিল, তাতে ফিফার সঙ্গে যে সংস্থাগুলির কমার্শিয়াল চুক্তি রয়েছে, তা কাতার মানতে বাধ্য। কিন্তু এদিন কাতার রয়্যাল পরিবারের পক্ষ থেকে যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, তাতে চুক্তিভঙ্গ স্পষ্ট। আর তাতেই ঝামেলা।

কাতার বিশ্বকাপে ফিফার বড়ো স্পনসরগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাডওয়েজার। ফিফার সঙ্গে চুক্তিমতো বিশ্বকাপের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর এই সংস্থাই একমাত্র বিয়ার বিক্রি করতে পারে। অথচ কাতারে তা সম্ভব নয়। দু'পক্ষের অনেক আলোচনার পর ঠিক হয়েছিল, এবার স্টেডিয়ামের ভিতর বিয়ার পান করা যাবে না। ম্যাচের তিন ঘণ্টা আগে এবং ম্যাচ শেষের এক ঘণ্টা সাধারণ দর্শকদের জন্য বিয়ার বিক্রি হবে। আর তার জন্য যা দাম নির্ধারিত হয়েছে, আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপে এত দাম দিয়ে কখনও বিয়ার কিনতে হয়নি। আধ লিটারের এক গ্লাস বিয়ারের দাম ১৪ ডলার। সব কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও, বিশ্বকাপ শুরুর দু'দিন আগে সংগঠকদের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, বিয়ার বিক্রি করা যাবে না। ফলে এই ব্যবসার কী হবে কেউ জানে না। □

নিজের তুলনা অন্যের সঙ্গে করতে নেই

একটি কাক এক বনে বাসা বেঁধে বাস করত। তার কোনো কষ্ট ছিল না। নিজেকে খুব সুখী মনে করত। একদিন উড়তে উড়তে এক সরোবরের ধারে একটি ধবধবে সাদা ও সুন্দর রাজহাঁসকে সাঁতার কাটতে দেখতে পেল। রাজহাঁসকে

দেখে কাক ভাবতে লাগল, এই হাঁসটি এত সাদা আর সুন্দর। নিশ্চয় খুব ভাগ্যবান। আর আর আমাকে দেখ, আমি কত কালো আর কুৎসিত। এই হাঁস অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি। সে হাঁসের কাছে গিয়ে তার মনের কথা বলল।

কাকের কথা শুনে হাঁস বলল, না বন্ধু, এরকম একেবারেই নয়। আগে আমিও মনে করতাম যে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও সুখী পাখি। সেজন্য আমি সুখীও ছিলাম। কিন্তু একদিন আমি একটি তোতাকে দেখলাম, কী সুন্দর সবুজ রং। পা, ঠোঁট লাল। গলার চারপাশ লাল রঙের মালার মতো রেখা। তাকে দেখে আমার মনে হলো এই তোতাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর সুখী পাখি।

হাঁসের কথা শোনার পর কাক তোতার কাছে গেল আর জিজাসা করল সে কি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর সুখী পাখি? তোতা উত্তর দিল, আমি নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর মনে করে খুব খুশিতে জীবন অতিবাহিত করতাম। তখন পর্যন্ত আমি ময়ূর দেখিনি। দেখার পর এখন আমার মনে হচ্ছে ময়ূরের চেয়ে সুন্দর আর কেউ হতেই পারে না। সেজন্য ময়ূরই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি।

তোতার কাছে শুনে কাক ময়ূরের খোঁজে বের হলো। উড়তে উড়তে সে এক চিড়িয়াখানায় পৌঁছলো। একটি গাছের ডালে বসে দেখল খাঁচায় বন্দি একটি সুন্দর ময়ূর। অনেক লোক তাকে দেখছে আর প্রশংসা করছে। সন্ধ্যার একটু আগে লোকজন আর নেই দেখে কাক ময়ূরের খাঁচার কাছে এসে তাকে বলল, তুমি কত ভাগ্যবান। তোমার এই সুন্দর রূপের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তোমাকে দেখতে আসে। সবাই কত প্রশংসা করছে। আর আমাকে তো কেউ আশেপাশে যেতেই দেয় না। দেখতে পেলেই তাড়িয়ে দেয়। সবাই দূর ছাই করে। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি তাই না?

কাকের কথা শুনে ময়ূরের চোখদুটি জলে ভরে গেল। ধীরে ধীরে ভারী গলায় বলল, বন্ধু, নিজের সৌন্দর্যের প্রতি আমারও খুব অহংকার ছিল। আমি এরকম ভাবতাম যে, পৃথিবী আর কী, সারা ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দর পাখি আমি । এজন্য খুব খুশিও ছিলাম। কিন্তু আমার এই সৌন্দর্যই আমার জীবনের দুঃখের কারণ হয়ে গেল। তার জন্যই আমি আজ চিড়িখানায় বন্দি। এখানে এসে সবকিছু ভালোভাবে দেখার পর আমার মনে হয়েছে যে, কাকই একমাত্র পাখি যে চিড়িয়াখানায় বন্দি নেই। এজন্যই আমার মনে হয়েছে আমি যদি কাক হতাম তাহলে অন্তত স্বাধীনভাবে সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারতাম। আর তখনই আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খুশি আর সুখী পাখি হতে পারতাম।

প্রিয় বন্ধুরা, আমরা হামেশা অকারণ অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করি আর দুঃখ পাই। ঈশ্বর সবাইকে আলাদা আলাদা ভাবেই তৈরি করেছেন আর আলাদা আলাদা গুণ দিয়েছেন। আমরা তার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে অকারণ কষ্ট পেয়ে থাকি। এজন্য অন্যের কাছে যা আছে তা দেখে হিংসা না করে নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই ভালো থাকা শিখতে হবে। মনের আনন্দ বাইরে খুঁজলে পাওয়া যায় না, সেটা আমাদের ভেতরেই লুকিয়ে আছে।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

ননীবালা দেবী

বিপ্লবী ননীবালা দেবী ১৮৮৮ সালে হাওড়ার বালিতে জন্মগ্রহণ করেন। এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় এবং ষোলো বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর ভাইপো অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ছদ্মবেশে তিনি আলিপুর জেলে গিয়ে এক বিপ্লবীর কাছ থেকে গোপন সংবাদ আনেন। পলাতক বিপ্লবীদেরও তিনি আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজ পুলিশ তাঁকে পোশোয়ার থেকে গ্রেপ্তার করে কাশী জেলে নিয়ে আসে। পরে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দিলে তিনি অনশন শুরু করেন। এক ব্রিটিশ সাহেব তাঁকে অপমান করলে তিনি তাকে সপাটে চড় মারেন। তাঁকে স্টেট প্রিজনার হিসেবে বন্দি রাখা হয়। বাঙ্গলার তিনিই একমাত্র স্টেট প্রিজনার। ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিভাণ্ডারের সংখ্যা হলো ঃ কাব্যগ্রন্থ-৫৬, গীতি পুস্তক-৪, ছোটগল্প-১১৯, উপন্যাস-১২, ভ্রমণ কাহিনি-৯, নাটক -২৯, কাব্যনাট্য-১৯, চিঠিপত্র সংবলিত পুস্তক-১৩, গান-২২৩২, অঙ্কিত চিত্রাবলী- প্রায় ২০০০।
- নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম মনোনীত করেছিলেন থমাস স্টার্জ মুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৈনিক নাম চু তেন তান।
- ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯১৫ সালে নাইট উপাধি প্রদান করে।
- ১৯১৯ সালে তিনি তা বর্জন করেন।

ভালো কথা

ঠাকুমার কালাচাঁদ

আমার ঠাকুমা শীত-গ্রীষ্ম ৩৬৫ দিন সকাল সাতটায় স্নান সেরে ঠাকুরঘরে পুজো দিয়ে প্রসাদগুলো একটা দলা করে বাইরে এসে বারন্দায় দাঁড়িয়ে 'কালাচাঁদ' বলে একটা ডাক দেয়। ওমনি একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে ঠাকুমার হাত থেকে প্রসাদের দলাটা ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে চলে যায়। ঠাকুমাকে দাঁড়কাকটা একটুও ভয় পায় না। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ঠাকুমা বলে তোকে ভয় পাবে, সরে দাঁড়া। আমি বলি তোমাকে কেন ভয় পায় না? ঠাকুমা বলে আমাকে ও অনেকদিন থেকে দেখছে তাই। তুই বড়ো হয়ে পুজো করে প্রসাদ দিলে তোকেও ভয় করবে না। ভালোবাসা পেলে কেউ ভয় করে না। ও কালাচাঁদ, মানে কৃষ্ণঠাকুর।

কল্পনা দত্ত, সপ্তম শ্রেণী, রাণাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) য় মা ণ	(১) ভ কা বা ল লি সু
(২) ন শা দ	(২) নি ন শা কে ন্তি ত

২৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) ধারাবাহিক (২) দোলনচাঁপা

২৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) হাস্যপরিহাস (২) সুখসংবাদ

উত্তরদাতার নাম
(১) শুভজিৎ দাঁ, টি পি রোড, কলকাতা-৬ (২) শ্রেয়শী ঘোষ,ঠাকুরদাস বাবু লেন, ই বি, মালদা (২) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, ই বি, মালদা। (৩) অভিজিৎ দাঁ, কেডিপি লেন, কল-৬

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

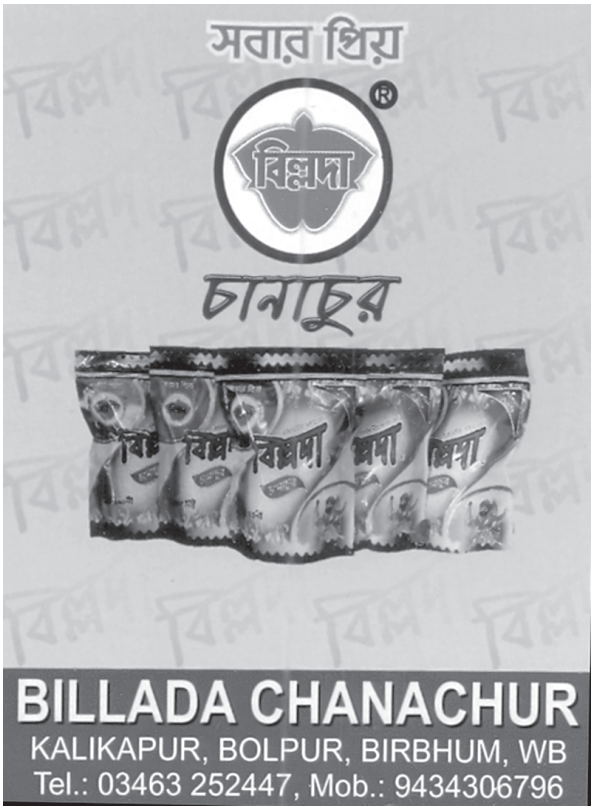

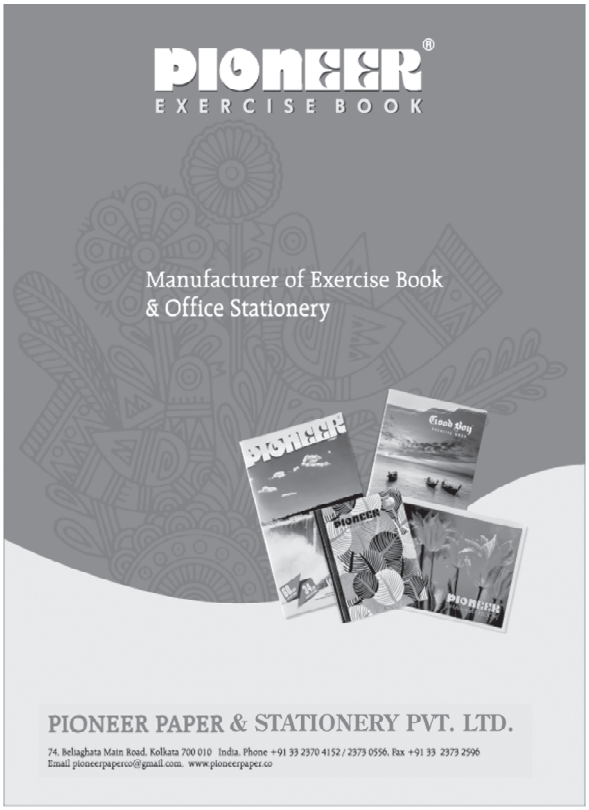

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাঙ্গালি জাতির সচেতন হবার সময় এসেছে

চন্দন রায়

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ— দু' দিকেই বাঙ্গালি জাতি যার যার নিজস্ব আঙ্গিকে বিভিন্ন উৎসবে মেতে ওঠে। একটা পরম্পরাগত বিশ্বাস থেকে প্রায় প্রতিটি বাঙ্গালি পরিবারে একটু ভালো-মন্দ খাওয়াদাওয়া করে, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার হিসেবে আদানপ্রদান করে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদ প্রদান এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে, এমনকী একসময় ডাকযোগে চিঠিপত্রের মাধ্যমে দূরের মানুষকে শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও আশীর্বাণী পাঠানো হতো। এখন টেক্সট মেসেজ নির্ভর বিনিময় চলছে। বাঙ্গলার গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র উৎসবমুখর। কোথাও বৈশাখী মেলা, সঙ্গে কুটিরশিল্প, সংগীত ও বাউল গানের আসর বসে। পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাসের তাঁবু পড়ে। কোথাও বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী ও পির-ফকিরের পূজা চলে। বাংলা নববর্ষকে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী এই ভাবে প্রাচীনকাল থেকে পালন করে আসছে। এত কিছুর পরেও আজ আমরা শঙ্কিত যে, বাঙ্গালি জাতি, বাংলা ভাষা, বাঙ্গালি কৃষ্টি-সংস্কৃতি- পরম্পরা পৃথিবীর বুকে স্বতন্ত্র ভাবে বেঁচে থাকবে নাকি অন্য কোনো নামে পৃথিবীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে? পশ্চিমবঙ্গও কি অন্য কোনো নামে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে পরিচিতি লাভ করবে?

বাঙ্গালি জাতি কি বিলুপ্তির পথে ধাবিত হবে? এই নিষ্ঠুর সত্যের উত্তর দিতে হলে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালি জাতি সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হয়। বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালি জাতি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। মহাভারতে এই দেশ বা ভূখণ্ডের উল্লেখ আছে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বিহার রাজ্য, আমাদের অখণ্ড বঙ্গভূমি আর বর্তমান ওড়িশা রাজ্য। কথিত, মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব বারো বছরের বনবাসকালে এই তিন রাজ্যে পদার্পণ করেননি, তাই এই ভূখণ্ড পাণ্ডববর্জিত ভূমি নামে লোকমুখে পরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের আলোচনা বঙ্গদেশ নিয়ে। ভারতবর্ষের এক ভূখণ্ড যার উত্তরে হিমালয় গিরিশৃঙ্গের সুবিশাল পর্বতমালা ও বনবীথি দ্বারা বেষ্টিত পশ্চিমপ্রান্ত বিহার ও ওড়িশা পাহাড় টিলা ও ঘন বনজঙ্গলের প্রাচীর আর দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি ও তার উপকূলবর্তী গভীর সুন্দরবন দ্বারা বেষ্টিত নদ-নদী-খাল-নালা ও উর্বর শস্যশ্যামলা সুবিশাল সমতল ভূমি। এই ভূখণ্ডই ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গভূমি বা বঙ্গদেশ, বর্তমানকালে বাঙ্গলা নামে পরিচিত। আর এই ভূখণ্ডে বহু প্রাচীনকাল থেকে লালিত পালিত হওয়া জাতিগোষ্ঠীই বাঙ্গালি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এদের মুখোচ্চারিত ভাষা 'বাংলা' নামে খ্যাত। এই জাতিগোষ্ঠীর ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর মুখে প্রথম ফুটে উঠে 'মা' নামক প্রথম শব্দ বাঙ্গালির মাতৃভাষা, পৃথিবীর সপ্তম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা। বাঙ্গালি জনসংখ্যা বর্তমান বিশ্বে ২৮ লক্ষের কাছাকাছি। এতো বিশাল জনসংখ্যার জাতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা আতঙ্কিত ও ভারাক্রান্ত যে, এই সমৃদ্ধ জাতির পরিচিতি বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

বাঙ্গালি জাতি সম্বন্ধে বলতে হলে প্রথমে জাতি বলতে কী বুঝায়? একটি জাতি বলতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠী যারা যুগ যুগ ধরে, পরম্পরাগত ভাবে বসবাস করে। তার নিজস্ব পরম্পরাগত

প্রাপ্ত ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, আচার বিচার, উৎসব পার্বণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, লোকজ ছড়া, সাহিত্য সংগীত, স্থানীয় খেলাধুলা, শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে জাতি বলা হয়। বাঙ্গালিও সেইরূপ একটি জাতি যারা বঙ্গদেশে নিজস্ব পরম্পরাগত ভাষা সংস্কৃতি, পোশাক- পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান নিয়ে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই সমৃদ্ধিশালী বিশাল জাতি ও ভূখণ্ড ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে করুণ ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে এবং বিলুপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়া বিগত হাজার বছর ধরে পর্যায়ক্রমে ঘটে চলেছে।

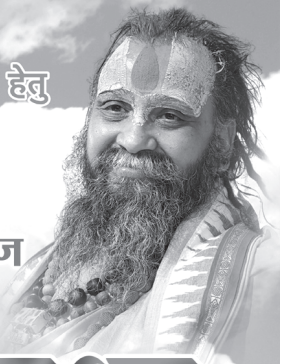

वनवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार,
आरोग्य, गौ ग्राम, जागरण एवं आध्यात्मिक चेतना हेतु
परम पूज्य जगद्गुरू द्वाराचार्य मलूकपीठाधीश्वर
स्वामी श्री राजेन्द्रदास देवाचार्य जी महाराज
के श्रीमुख से
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ
अष्टोत्तर (108) पारायणी सहित
बृहस्पतिवार 15 दिसंबर से बुधवार 21 दिसंबर 2022 | दोपहर 3:30 से सायं 7:00 बजे तक
स्थानः विधान गार्डेन-1 (गौतम केफे के सामने)
11, केनल रोड, उल्टाडांगा, कोलकाता-700 067
हमारी योजनाओं के अन्तर्गत
संस्कार केन्द्र 65672
श्रीहरि रथ (वीडियो रथ) 63
प्रशिक्षित कथाकार 4342
श्रीहरि क्रार्यक्रम 2541
एकल विद्यालय 78324
आरोग्य संसाधन केंद्र 52
To Support
Shreehari Satsanga Samity
For just ₹ 5,000/- you can adopt one Sanskar Kendra for one year
Friends of Tribals Society
For just ₹ 22,000/- you can adopt one Ekal Vidyalaya for one year
परम पूज्य महाराज जी द्वारा स्थापित राजस्थान के श्री जड़खोर गोधाम में हजारों गोवंश की पूर्ण निष्ठा से गोसेवा तथा श्रीधाम वृंदावन स्थित श्री मलूकपीठ आश्रम में संतसेवा का महत् कार्य संपन्न हो रहा है।
समिति को दिया गया अनुदान आयकर की धारा 80G के अन्तर्गत कर मुक्त है।
हमारी संस्था CSR के अंतर्गत पंजीकृत है।
आयोजक
श्रीहरि
श्रीहरि सत्संग समिति, कोलकाता
FRIENDS OF TRIBALS SOCIETY
EKAL ABHIYAN A PEOPLE'S MOVEMENT
Ph: +033 2454 4510 / +91 80176 06110 / 98748 65000
Email: shss97@gmail.com | Website: www.shss.org.in
आप सभी सादर आमंत्रित हैं

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে আরবি আক্রমণকারী বখতিয়ার খলজি বাঙ্গলার সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাঙ্গলার সিংহাসন দখল করে নিল এবং বাঙ্গলার প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আরবীয় ইসলামি আগ্রাসন শুরু হলো।

আরবীয় ইসলামি হানাদাররা আশঙ্কা করেছিল হিন্দুদের এই দেশে ইসলাম বিশ্বাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটলে তাদের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য শাসন করা দুরূহ হয়ে পড়বে এবং একদিন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষদের ছলে-বলে- কৌশলে ইসলামের পতাকা তলে আনতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবর্তন করলো। এই ভাবে ভারতে দীর্ঘ ইসলামি শাসনকালে ভারতের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ ভয়ে ইসলাম স্বীকার করল এবং ভারত ভূমিতে আরবীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতির এক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হলো।

এই প্রক্রিয়ায় প্রবল প্রভাব বাঙ্গালি জাতির মধ্যেও পড়লো। ফলে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালি সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড় লো। অন্যদিকে ধর্মান্তরিত বাঙ্গালি সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থান দখল করে নিল। পরিণতিস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশ ভাগ হয়ে পূর্বপাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো। আর হিন্দু বাঙ্গালিদের একাংশ ভারতের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ গঠন করলো। এদিকে পূর্বপাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু বাঙ্গালি পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো এবং বসবাস করতে থাকলো।

বঙ্গবিভাগের ফলে সুবিশাল বাঙ্গালি জাতি স্থায়ীভাবে দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়ে গেল। পূর্বপাকিস্তানের বাঙ্গালিদের পরিচিতি হলো বাংলাদেশি আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের পরিচিতি হলো ভারতীয় বাঙ্গালি নামে। প্রাচীন বাঙ্গালি জাতি বিশ্বে দুই ভিন্ন জাতিসত্তায় বিভক্ত হলো। ফলে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাবে আরবীয় মরু সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, পোশাক- পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, এমনকী নিজ নাম, পরিচয় ও দৈনন্দিন মাতৃভাষায় আমূল পরিবর্তন এসে গেলে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত কোনো কোনো অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে উর্দু ভাষাভাষী ইসলামি জাতিসত্তা প্রবল ভাবে প্রকট হলো। উর্দু ও আরবিকে ইসলামি ভাষা মনে করে তারা তাদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নিল। পরম্পরাগত বাঙ্গালিয়ানা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে হারিয়ে গেল। গড়ে উঠলো উর্দু, আরবি ও বাংলা মিশ্রিত ভাষা ও সামাজিক পরিচিতি।

দেল-দোল-দুর্গোৎসব হিন্দু বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব যা বর্তমান বাংলাভাষী মুসলমান গোষ্ঠী বর্জন করেছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ, লোকায়ত উৎসব যেমন বাংলা নববর্ষ, দুর্গাপুজো, নবান্ন, পৌষপার্বণ, দোলের মতো বিভিন্ন ঋতুর উৎসবগুলিতে হিন্দু সংস্কৃতির তকমা লাগিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে তার ফলে মুসলমান সামাজিক জনজীবনে মরু সংস্কৃতি উৎসব ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়েছে। মরু সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাবে হিন্দু বাঙ্গালি দর্শন (বিশ্বাস), সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি ও পরম্পরা বর্জিত আরবিমিশ্রিত বাংলাভাষী এক নয়া জনগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছে যা মূল বাংলাভাষী মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১৮ কোটি মতো।

এদিকে সনাতনী ধারার বাংলাভাষীর জনসংখ্যা মাত্র ৯ কোটির মতো যারা পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে শুদ্ধ বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি দ্রুততার সঙ্গে লুপ্ত হতে চলেছে। প্রথম কারণ হিসেবে ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গ ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রিত হয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সুযোগ পায়। বহু বছর ধরে বসবাসের ফলে পরবর্তী প্রজন্ম বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক প্রাদেশিক ভাষায় লেখাপড়া করতে বাধ্য হয়। দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় ভাষাচর্চার ফলে বাংলাভাষা চর্চার প্রয়োজন হারিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে পোশাক পরিচ্ছদ, স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করছে, এমনকী সামাজিক বিবাহ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক অবাঙ্গালি স্থানীয়দের সঙ্গে গড়ে উঠছে। অতএব এক দুই প্রজন্মের ব্যবধানে তাদের বাঙ্গালি সত্তা ও পরিচয় সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং ফলে তারা পরবর্তীতে নতুন জাতিগত পরিচয়ে স্বীকৃতি লাভ করবে।

দ্বিতীয় কারণ সারা ভারতে ও বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালি সমাজে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ছেলে- মেয়েদের লেখা পড়া করানোর প্রবণতা চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ওই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে বিদ্যমান নয়। পশ্চিমি মিশ্র ধ্যানধারণার শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে প্রাধান্য পায় এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রেও একই ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা হওয়াটা স্বাভাবিক। ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চা এমনকী পোশাক-পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাস ও সামাজিক মূল্যবোধ ও সম্পর্ক বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমি কসমোপলিটন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, তাদের কাছে বাঙ্গালিয়ানা দুর্বল বা সখে পরিণত হয়েছে। এই প্রবণতা গ্রামবাঙ্গলায় সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

লোকগীতি, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, কবি বা সারি গান, এমনকী পুরানো বাংলাগান, নজরুল ও রবীন্দ্রসংগীতের পরিবর্তে রক ও ডি.জে সংগীত দখল করে নিয়েছে। বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য ও সৃজনশীল সংগীত ইতিহাসের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় কারণ, পশ্চিমবঙ্গের চারদিকে বিভিন্ন ভাষাভাষী, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর বহু বছর ধরে পাশাপাশি বসবাসের ফলে মিশ্র ও দ্বৈত ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। অখণ্ড বঙ্গের সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন ভাষার দেশ মায়নমার নেপাল ভুটানের মতো স্বাধীন দেশ এবং মণিপুর, ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী, সংস্কৃতি ও বিশ্বাস বহনকারী ভারতের অঙ্গরাজ্য। ফলে সীমান্তাঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ ও রাজ্যের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এমনকী সামাজিক ও পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। ফলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন নতুন সংকর জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতিসমূহকে কখনো বিশুদ্ধ বাঙ্গালিজাতি হিসেবে দাবি করা যাবে না।

এই বিষয়সমূহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সমাজবিদ্যাগত ভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা

যারা, শুদ্ধ বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্বসংকট কয়েক শো বছরের মধ্যে দেখা যাবে, একথা হলফ করে বলা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সমাজ ও জাতির অস্তিত্ব বিনাশের ইতিহাসের দিকে তাকালে বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে। যেমন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা, মায়া, অ্যাসেরীয়-সহ বিভিন্ন অতি প্রাচীন সভ্যতার জাতির পরম্পরার ভাষা সংস্কৃতি রীতিনীতি ও বিশ্বাস বিলীন হয়ে নতুন ভাষা সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের মিশ্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। একই ভাবে সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন গ্রিক, রোমান, মেসোপটিয়া, মিশর, পারস্য ও গান্ধার সভ্যতার জাতিগোষ্ঠী আজ কোথায় হারিয়ে গেছে।

বর্তমান প্রজন্ম ভুলে গেছে তাদের পূর্বপুরুষের সভ্যতার ভাষা, কৃষ্টি, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ইতিহাস। সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন পরম্পরার শিকড় ছিন্ন বিভিন্ন নতুন ধারার সেমেটিক বিশ্বাসের মিশ্র জাতিগোষ্ঠী। একই অবস্থা সমগ্র বাঙ্গলায় ক্রমান্বয়ে দ্রুততার সঙ্গে একই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাচীন জেরুজালেম ও পারস্যের ক্ষেত্রে ঘটেছে। জেরুজালেমে বসবাসরত প্রাচীন ইহুদি জাতি দীর্ঘদিন আরবের ইসলামি শাসনের প্রভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামি শাসনে তারা তাদের প্রাচীন হিব্রু ভাষা, সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে আরবীয় ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিচর্চা সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপিত করে এবং অবশিষ্ট ইহুদি জনগোষ্ঠী তাদের প্রাচীন বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে জেরুজালেম ত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করে।

দীর্ঘকাল ব্যাপী বসবাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় সেইসব দেশের ভাষা, সংস্কৃতি স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করেছে। তবে স্বাধীন ইজরাইল রাষ্ট্রগঠনের সুবাদে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ইহুদি ধর্মানুসারী মিশ্র ভাষা-সংস্কৃতির ধর্মীয় ভিত্তির আধুনিক নতুন এক ইহুদি জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রাচীন ধারার জেরুজালেমীয় মৌলিক জাতি আজ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই ধারা ও বিশ্বাসের দুই জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে (প্যালেস্টাইন ও ইজরাইল)। ঠিক একই ভাবে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন পারস্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পার্শি জাতির ক্ষেত্রে।

জেরুজালেমের মতো প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য আগ্রাসী আরবীয় মুসলমান কর্তৃক ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি অনুশাসন ও অনুশীলনের প্রভাবে ধীরে ধীরে প্রাচীন পারস্যে ইসলামিক আরবীয় ভাষা ধর্ম, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-বিচার গ্রাস করে নিয়েছে। পার্শি ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি বিনাশ হয়ে গেছে। এমনকী দেশের নাম পরিবর্তন হয়ে আজ ইরান নামে বিশ্বমানচিত্রে স্থান পেয়েছে আর সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন পারস্য দেশের নাম মানচিত্র থেকে মুছে গেছে।

অতি নগণ্য সংখ্যক আদি জরাথুষ্টপন্থী পার্শি জনগোষ্ঠী স্বীয় ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি রক্ষায় ইহুদি জাতির মতো নিজ ভূমি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দীর্ঘকালব্যাপী বসবাসের কারণে তারা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসটুকু অবশিষ্ট আছে এবং আজও বহন করে চলেছে। ফলে তার পরিণতিস্বরূপ প্রাচীন পার্শিজাতি তাদের নিজস্ব প্রাচীন ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে আজ প্রাচীন পারস্য পরম্পরা ও ভাবনা বিরোধী ইরানি মুসলমান ও ভারতীয় পার্শি জাতি নামে দুই ভিন্ন নতুন জাতিতে পরিণত হয়েছে।

একই ঘটনা সারা বিশ্বে ২৮ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী জাতির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ঘটে চলেছে। ফলে এটাই বাস্তব সত্য, অদূর ভবিষ্যতে ইহুদি ও পার্শিদের মতো দুই ভিন্ন সত্তা ও বিশ্বাসের ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্র বাংলাভাষী নতুন জাতি ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে এবং শুদ্ধ বাঙ্গালি ও বাঙ্গালিয়ানা বিলুপ্ত হবে। □

প্রয়াণ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহ-সভাপতি তথা প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ গত ৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীচরণে লীন হলেন। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে ঈশ্বরের নিকট তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড নম্বর সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

অমর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ওপর নির্মিত তেলুগু ছবির প্রদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ গত ২২ নভেম্বর ভারতের ৫৩তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই)-এর ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর বীর ক্ষুদিরাম বসুর ওপর তেলুগু ভাষায় নির্মিত একটি বায়োপিক প্রদর্শিত হয়। ফিল্মটির পরিচালক বিদ্যাসাগর রাজু বলেন, 'দেশের স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান সম্পর্কে সকলেই যাতে জানতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে।'

ক্ষুদিরাম বসুর বায়োপিক প্রদর্শন উপলক্ষ্যে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক বিদ্যাসাগর রাজু জানান, ফিল্মটি তৈরির আগে ক্ষুদিরামের জীবন ও সময়কাল সম্পর্কে বিশেষ পড়াশোনা ও গবেষণা করতে হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী, বঙ্গভঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও বিশেষ পঠনপাঠন, সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে এই ছবি নির্মাণের কাজে এগোতে হয়েছে।

ছবিটিতে স্বাধীনতা অন্দোলনের সময়ের বহু খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সেই সময়কার বিশিষ্ট আইনজীবী নরেন্দ্র কুমার বসু, যিনি ক্ষুদিরামের হয়ে আদালতে লড়াই চালিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কেও ছবি নির্মাতাদের খোঁজ করতে হয়েছে। ছবিটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ভারতের

প্রথম পতাকাটির নকশা যে ভগিনী নিবেদিতার হাতে তৈরি তাও এখানে তুলে ধরেছেন নির্মাতারা। ১৯০৬ সালের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও স্থান পেয়েছে এখানে। ওই বছরই দেশে প্রথম সাউন্ড রেকর্ডিং ব্যবস্থা চালু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইসময় 'বন্দে' গানটি রেকর্ড করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক বলেন, ক্ষুদিরাম বসুর জীবন ও সময়কালের ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা যায় যে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা এই ছবি তৈরির কাজে সহায়ক হবে বলে মনে হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের ভয়াবহ ও বিভৎস দিকটির কথাও তুলে ধরা হয়েছে ফিল্মটিতে। চিত্রনাট্যে তৎকালীন বাঙ্গলার বহু ঐতিহাসিক চরিত্র স্থান পেয়েছে। বায়োপিকে ক্ষুদিরাম বসুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দক্ষিণী নায়ক রাকেশ জাগরলামুণ্ডি। রাকেশ জানান, ক্ষুদিরামের চরিত্রটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরা ছিল তাঁর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। টিমের সকলের সহযোগিতায় তিনি বাঙ্গালি মানসের ক্ষুদিরাম বসুর চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন বিবেক ওবেরয়, অতুল কুলকার্নি ও নাসের।

কেন্দ্রীয় আবাসন আইন চালু না হওয়ায় উদ্বিগ্ন আবাসন ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি আবাসন ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ আইন ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেটিং অ্যাক্ট (হিরা)গত বছরের ৪ মে অসাংবিধানিক বলে খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তার আগেই পাশ হয়েছে কেন্দ্রের আবাসন আইন 'রেরা'। কিন্তু এরাজ্যে কার্যকর হয়নি এই কেন্দ্রীয় আইন। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আবাসন ক্রেতাদের সংগঠন ফোরাম ফর পিপল্‌স কালেক্টিভ এফোর্টস (এফপিসিই)। সংগঠনের সভাপতি অভয় উপাধ্যায় বলেন, ''আবাসন ক্ষেত্রে তেমন কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বিনা রেজিস্ট্রেশনে নিয়ম না মেনে একের পর এক প্রকল্প গড়ে তুলছে নির্মাণ সংস্থাগুলি। এমতাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছেন।''

এ ব্যাপারে এফপিসিই-র সঙ্গে আবাসন দপ্তরের মুখ্যসচিবের বৈঠক হয়। সেখানে দ্রুত রেরা চালু করার আবেদন জানান তারা। তাদের বক্তব্য, হিরা খারিজ হয়ে যাওয়ার পর বহুদিন কেটে গেছে, কিন্তু এখানে কেন্দ্রের আবাসন আইন চালু করা হয়নি। সংগঠকরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন, আখেরে কোনও লাভ হয়নি। সভাপতি অভয় উপাধ্যায় জানান, রাজ্যের আবাসন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের আপিল ট্রাইব্যুনালও এখনও কার্যকর করা হয়নি। ফলে কেন্দ্রীয় আবাসন আইনের আওতায় যেখানে অন্যান্য রাজ্যের ক্রেতারা সুরক্ষিত সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্রেতাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে আবাসন নির্মাতারা।

With Best Compliments from :-

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

(MARKETING DIVISION)

WEST BENGAL STATE OFFICE

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আগামী জানুয়ারি ২০২৩-এ ১৮ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন। স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২৩।।

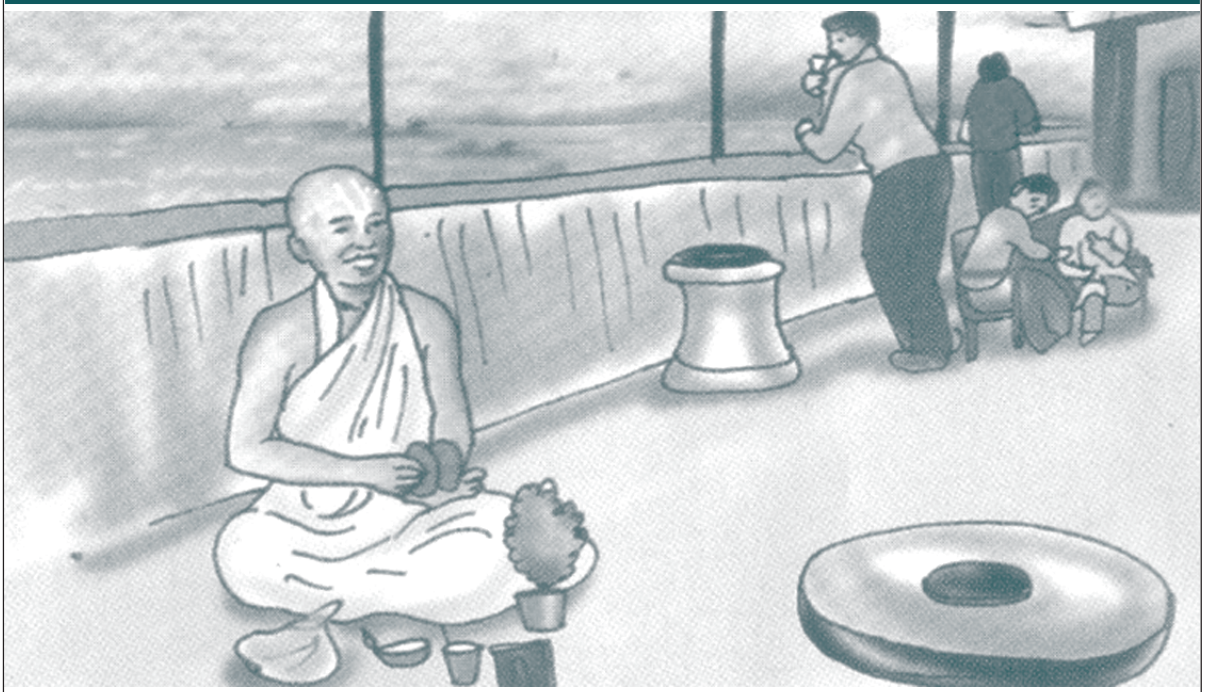

মহানামব্রতজীর পরনে সেই সন্ন্যাসীর পোশাক। দুটি মাত্র কম্বল ছিল সঙ্গে। আর ছিল দুটি বাক্সে দর্শনের বই, জগদ্বন্ধু প্রভুর ছবি, একটি তুলসীগাছ, একজোড়া করতাল। ডেকের যাত্রীদের জাহাজের খাবার দেওয়া হয় না। যদিও তাঁর সঙ্গে কয়েক সের চাল আর আলু ছিল, তিনি চিড়ে আর মিছরি খেয়েই থাকতে লাগলেন। জাহাজের এক নাবিক বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করে তাঁকে অবশেষে রান্না করে খাবার অনুমতি দিলেন।

*তের দিন পর জাহাজ এল ভেনিসে। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন পরিবেশ। ভেনিসের পথ জলময়। নৌকা করে সেখানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়। মহানামব্রতজী সেভাবেই ভেনিসের **Pissa San Marco**-র জড় ঘড়ি দেখলেন।*

(ক্রমশ)